দোয়া

– আতাউর রহমান জামাল

দেশ ছেড়েছি ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর ২৪ তারিখে মরুর দেশ কুয়েতে একটি কোরিয়ান কম্পানিতে চাকরি নিয়ে। বেতন বাংলাদেশের দশ হাজার টাকার মতো। থাকা-খাওয়া ফৃ। অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে সবাইকে দূরে ফেলে এসেছি প্রবাসে ভাগ্যটাকে পরিবর্তন করবো বলে। কিন্তু নিয়তির কি খেলা! মনে হয়, দিন দিন আরো নিচে নেমে যাচ্ছি, সংসারের চাপে কুলিয়ে উঠতে পারি না। খরচ বেড়েই চলেছে।

ছোট ভাইটা ডিগ্রি ফাইনাল দিচ্ছে। তার বড়টা এমএ ফাইনাল দিয়ে বেকার বসে আছে। মাঝে মধ্যে পত্র লেখে, ভাই! এভাবে আর কতো। একটু চেষ্টা করুন।

কিন্তু আমি কি করবো তার জন্য! ভালো একটা ভিসা পেতে কম করে হলেও দেড় লাখ টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাবো এতো টাকা। আমার হাত যে একবারে খালি। দেশে যে সে একটা চাকরি করবে সে সুদূর পরাহত। মেজো ভাই সউদি আরব যাওয়ার সময় তাকে দিয়েছি আশি হাজার টাকার মতো।

এরই মধ্যে খবর পেলাম আমার জনম দুঃখী মায়ের গলায় ক্যান্সার। এ কথা শোনার পর বোধশূন্যহীন এক মানুষে পরিণত হয়েছি। দিশেহারা হয়ে গেলাম। এখন আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ভরসা নেই। মায়ের চিকিৎসার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা পাঠালাম। ভর্তি করা হলো মিরপুর *ডেল্টা ক্লিনিকে*। কিন্তু রোগের কোনো উন্নতি নেই। দিন দিন আরো অবনতি। খেতে পারছেন না ঠিক মতো, কথা বলতে কষ্ট হয়। এখানে আমার চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়। তবে করার তো কিছুই নেই।

মেজো ভাই সউদি আরব গিয়েছেন আজ ছয় মাস। একটি পয়সা দেননি বাড়িতে। মায়ের এতো বড় অসুখ শোনার পরও তিনি চুপ করে আছেন। বড় ভাই আলাদা হয়ে গিয়েছেন আজ তিন বছর। তিনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন। তারও তো একটা সংসার আছে! বাচ্চারা বড় হচ্ছে। বড় মেয়েটা এবার ক্লাস টেনে পড়ছে। সামনে তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নময় জীবন। তিনি আর কতো করবেন আমাদের সহযোগিতা। বাবা বৃদ্ধ মানুষ। সংসারের ছায়া হয়ে আছেন ওনার এটাই বড় সহযোগিতা আমাদের জন্য। পুরো সংসারটাই এখন আমার মাথার ওপর।

একবার মা চিঠি লিখেছিলেন বাবা, বাড়িতে আয়, তোকে একটু দেখি। আসার সময় এক সেট গয়না নিয়ে আসবি।

মনে মনে বুঝতে পারছি, মা কি বলতে চাচ্ছেন। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। কিন্তু আমি যে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। এর মধ্যে আরেক বিপদ। কম্পানি রিলিজ করে দিয়েছে। হাতে তেমন একটা পয়সাও নেই। ভালো কম্পানি পাচ্ছি না। কোনো উপায় না পেয়ে বাইরে ফৃ ভিসা লাগিয়েছি। বাংলা নব্বই হাজার টাকার মতো লেগেছে। এর অর্ধেক বন্ধুদের কাছ থেকে ধার নিয়েছি।

বাড়িতে ফোন করেছিলাম। মা কান্নাকাটি করছেন একবার বাড়ি আসার জন্য, আমাকে একটু দেখবেন! কিন্তু আমি কিভাবে বাড়ি যাবো! আমি যে এখানে একবারে শূন্য অবস্থায়। এদিকে মায়ের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে, অথচ আমার চোখের পানি ফেলা ছাড়া কিছুই করার নেই।

এবার পবিত্র কোরবানির ঈদের নামাজ শেষে যখন ইমাম সাহেব বললেন, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, বিশেষ করে মা-বাবার জন্য দোয়া চাইতে আল্লাহ পাকের দরবারে তখন খোদার কাছে আমার মিনতি, হে খোদা! তুমি আমার মাকে ভালো করে দাও। ভালো না করো, অন্তত ততোদিন বাচিয়ে রাখো যতোদিন আমি দেশে না যাই। আমি যেন দেশে গিয়ে একটিবারের জন্য আমার মাকে দেখতে পারি।

পাঠক-পাঠিকার প্রতি অনুরোধ, নামাজ শেষে আমার মায়ের জন্য একটু দোয়া করবেন, আমার মা যেন ভালো হয়ে ওঠেন। প্লিজ!

কুয়েত থেকে

দিল্লি থেকে প্যারিস

– হুমায়ুন

ফেনীর সোনাগাজীতে আমার বাড়ি। কলেজের ভিপি ও থানা পর্যায়ে সংগঠনের নেতৃত্বের কারণে এলাকায় পরিচিত ছিলাম। বাবা চাকরির সুবাদে ঢাকায় থাকতেন। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পরে হাজারী বাহিনীর তাণ্ডবে আমাদের ঢাকায় এসে জনৈক আত্মীয়ের বাসায় উঠতে হলো। ডিসেম্বর বাবার অবসর, পরিবারের বড় ছেলে, রাজনীতির প্রতি সবার ঘৃণা, তাই কেউ আমাকে এ দেশে রাখার পক্ষে না।

১৯৯৭ সালে প্রবাসের চেষ্টা আর ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলাম। সোনাগাজীর বিএনপি এমপি ছিলেন শিল্পপতি এবং এ দেশের জনশক্তি রফতানিকারকদের অন্যতম। ফেনীতে তখন সন্ত্রাসের তাণ্ডব। এমপি আমাকে এলাকায় সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে বললেন। আমার পরিবার এ কথা জানতে পেরে এমপিকে অনুরোধ করে, আমাকে রাজনীতিতে না জড়িয়ে যেন বিদেশ পাঠিয়ে দেয়। সততার কারণে অতীতে পার্টি থেকে কিছু চাইনি। পরিবারের শোচনীয় অবস্থায় বহু অনুরোধেও লাভ হলো না। যারা এমপির বিরুদ্ধে তাদের তিনি পাঠিয়েছেন। যে সন্ধ্যায় আশা হারালাম সেদিন বারিধারা লেকে বসে কেদেছি।

শুরু হলো পিচঢালা পথে একাকী চেষ্টায় ছুটে চলা। কতো দালালের পাল্লায় পড়লাম, কতো ধরনের ছবি তোলা হলো। চারটা পাসপোর্ট বানাতে হলো জরুরিভাবে। আরেক দালালের পরামর্শে বয়স বাড়িয়ে নতুন পিপি করলাম। পিপিতে কিছু দেশের ভিসা থাকলে পশ্চিমা দেশের ভিসা পাওয়া সহজ। তাই ইনডিয়া, নেপাল ভ্রমণ করতে হয়েছে বহুবার। যে কোনো সময় ভিসা হবে, টাকা প্রস্তুত রাখতে হবে। বাধ্য হয়ে দেশের দামি জমি অর্ধেক দামে বিক্রি করতে হলো। কেন জানি তবুও যাওয়া হলো না। দালালের কাছে বার বার যেতে শুধু জুতার তলা ক্ষয় হলো। কখনো মেক্সিকো দিয়ে আমেরিকা যাবার চেষ্টা। আবার আরেক দালালের কথা মতো ইনডিয়া থেকে আমার নামে পিপি করা হলো। কলকাতা, দিল্লিতে দুই মাস থেকে বহু টাকার ক্ষতি এবং দালাল কর্তৃক এক লাখ টাকা নেয়া, এমনি একের পর এক কতো ঘটনা ঘটলো।

সেই দিনগুলো ছিল খুব বেদনাময়। অবসরের সময় পাওয়া টাকা শেষ। জমি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে রাজধানীতে সাতজন লোকের কৃচ্ছ্রতা সাধন করে জীবন যাপন, অনার্স পড়ুয়া চার ভাই বোনের শিক্ষা ব্যয়, কয়েক মাসের বাসা ভাড়া বাকি। ছোটরা আমার রাজনীতির কারণে সৃষ্ট অবস্থায় পেছনে ক্ষোভ প্রকাশ করে। আত্মীয়স্বজন ও অন্যদের মুখোমুখি হতে সংকোচ বোধ করি। কি করি? এর জবাবে নিরুত্তর। ছোট বোন বিয়ের যোগ্য। ঢাকায় বাড়ি নেই, পিতার অবসর, আমার কাহিনী শুনে পাত্রপক্ষ পিছিয়ে যায়। এভাবে চারটি বছর গেল।

২০০১-এর শুরুতে ইটালির জনৈক আত্মীয়ের মাধ্যমে জানলাম সেখানে স্পন্সর করা হচ্ছে। টাকার রিস্ক না থাকায় পিপি ফটো পাঠালাম। জেনুইন চ্যানেল। তাই অপেক্ষার পালা।

আওয়ামী আমল শেষ হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলো। অথচ আমি ব্যর্থ।

সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডি ঘটলো। ২০ সেপ্টেম্বর হঠাৎ জানলাম ১১ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট কারণে স্পন্সর প্রক্রিয়া স্থগিত। আরো ট্র্যাজেডি, দ্বিতীয় সপ্তাহের যেদিন আমার ফাইল প্রক্রিয়ার কথা সেদিনই স্থগিত। কতো দুর্ভাগ্য! দুটো দিন চোখের পানি ফেলেছি।

হতাশা আর কষ্টের ভাবনার মাঝে কাউকে কিছু না বলে বহুদিন পর জন্মস্থানে নির্বাচনী প্রচারণায় মিশে গেলাম।

চার দলীয় জোট ক্ষমতায়। এবার হয়তো সফল হবো। বিদেশ নয়। কিন্তু দেখা গেল সুবিধাবাদী নব্যলোকদের জন্য আমরা অবহেলিত। ভাবলাম, কারো আশায় নয়।

২০০২ সালের মার্চে ইটালির আত্মীয় এলেন। এরপর তো ট্র্যাজেডিময় ঘটনার শুরু। তিনি সঙ্গে দুই তিন লোক নিয়ে যাবেন। আমার প্রচণ্ড অমতে অভিভাবকরা ওই লোকের কথায় বিশ্বাস করলেন এবং ব্যাংকে গচ্ছিত শেষ টাকাগুলো দিলেন। সবার আশা, এক মাস ধার-কর্জ করে সংসার চলবে, পরের মাসে তো ডলার। আমার ছবিযুক্ত সৌজন্যে (ইটালির) পিপি, তাতে নানান সিল দেখে অবাক হলাম। ইটালির ভাষা শিখছি। মনে সন্দেহ। আমার কথাকে কেউ গ্রাহ্য করছে না। রুট ঘোষণা হলো। দিল্লি-প্যারিস-মিলান। কলকাতার ফ্লাইটের দিন বাসায় রাগারাগি শেষে বললাম, পনেরো দিনের জন্য যাচ্ছি এবারও ব্যর্থ হবো।

মে মাসের ১৫ তারিখ রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লিতে। ওখানকার দালাল রিসিভ করলো। আত্মীয় আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে দালালের নিজস্ব হোটেলে উঠলেন। হোটেলে আরো যাত্রী। দালালের নজরবন্দী থাকলাম। কয়েকদিন পর জানলাম দিল্লিতে যে টাকার চুক্তি, এখন যাত্রী চলে আসায় সুযোগ বুঝে তিনগুণ টাকা চাচ্ছে। বাধ্য হতে হলো। কথা ছিল আত্মীয় আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন। হঠাৎ সিদ্ধান্ত হলো আমাকে একা পাঠানো হবে। আমি পৌছালে অন্যরা যাবে। আত্মীয় টাকার গ্যারান্টির জন্য দিল্লি থাকবেন। কোনো এয়ারলাইন্স টিকেট দিচ্ছে না কাগজপত্র দেখে। শেষে এয়ার ফ্রান্সের মাধ্যমে দিল্লি-প্যারিস-মিলান টিকেট পেলাম। প্যারিসে সতেরো ঘণ্টা ট্রানজিটের মধ্যে আমাকে অবশ্যই এয়ারপোর্ট ক্রস করে বের হতে হবে মিলানে ধরা পড়ার রিস্ক এড়াতে। প্রয়োজনে ব্যাগ ফেলে রেখে বের হতে হবে।

রাত বারোটায় ফ্লাইট। এয়ার ফ্রান্সের কাউন্টারে যেতেই মহিলা স্টাফ বললেন, ডকুমেন্ট নকল।

বহু কষ্টে বোঝানোর পর বোর্ডিং কার্ড পেলাম। পরক্ষণেই অন্য পুরুষ স্টাফ বললেন, জাল কাগজপত্র। বুঝিয়ে লাভ হলো না। বুঝলাম এদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট না করাতে এই অবস্থা।

মনটা খারাপ করে বাইরে এসে সব বলার পর দালাল বললো, আমার ব্যবহার ও তর্কের জন্য স্টাফরা অসন্তুষ্ট। পরদিন একই সময়ে ফ্লাইট। এবার ইটালিগামী জনৈক যাত্রীকে দিয়ে আমার সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে। ইটালিয়ান ভাষায় কোনো মতে কথা বলার পর অফিসার সন্তুষ্ট হয়ে দুটো বোর্ডিং কার্ড দিলেন। ইমিগ্রেশনে কোনো বাধা পেলাম না।

বিশাল বোয়িংয়ে রাতভর টেনশন। ভোর ছয়টায় স্বপ্নের প্যারিসের চার্লস দি গল এয়ারপোর্টে। হঠাৎ দেখলাম, ট্রানজিট মাত্র দুই ঘণ্টা। বিশাল এয়ারপোর্টে এদিক-সেদিক ছুটছি। কি করবো? দালালের বৃফ মতো এগিয়ে গেলাম কাউন্টারে। এরপর অন্য জগৎ।

আমাকে এক রুমে নেয়া হলো। শুধু প্রার্থনা করছি। এক ঘণ্টা পর এক অফিসার এক রুমে নিয়ে পুরো শরীর, ব্যাগ, তন্ন তন্ন করে সার্চ করলেন। বললাম, ইংরেজিতে কথা বলবো। নিগ্রো মহিলা অফিসারকে বোঝালাম, কি অপরাধ আমার?

কাগজপত্র নকল হলে আমাকে মিলান পাঠাও, যেহেতু ইটালির কাগজ, শাস্তি হলে সেখানে হবে। এছাড়া মিলানের বোর্ডিং কার্ড তো আছেই। একটা কাগজে স্বাক্ষর করতে বললো, রাজি হইনি। অন্য স্টাফরা আমাকে এবং তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশকে নিয়ে বাজে উক্তি ও সন্দেহযুক্ত বললো। বুঝলাম টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির পর পশ্চিমাদের ধ্যান-ধারণা, প্রেক্ষাপট পাল্টে গেছে। জোর করে সেলে পাঠালো। সেখানে বিশ বাইশজনের সবাই মুসলিম দেশের। আলো নেই, নোংরা। স্বপ্নের প্যারিসের সঙ্গে এই রুমের বিশাল প্রভেদ। কতো কষ্টের মুহূর্ত কেটেছে। সংক্ষিপ্ততার কারণে সেই ইতিহাস লেখার সুযোগ হচ্ছে না।

বহু পরে আফ্‌কানদের হোটেলে নেয়া হলো। ভাবলাম, আমাকেও নেয়া হবে। একটা ফোন করার সুযোগ তো পাবো। কিন্তু না। রাতে হাই ভোল্টেজের তীব্র আলো জ্বললো চোখের ওপর মানসিক টর্চারের জন্য। চুক্তি মতো আত্মীয় সঙ্গে এলে তবে নিয়ম অনুযায়ী উকিলের মাধ্যমে আমাকে তিনি বের করে নিতেন। সকালে আফ্‌কানদের ফেরত আনা হলো। তারা হোটেলে কোনো সুযোগই পায়নি। চল্লিশ ঘণ্টা হতে চললো। টয়লেটে যেতে নিষেধ, প্রচণ্ড ক্ষিধে। অবশেষে দিল্লি ব্যাক করতে বাধ্য করা হলো। বোয়িংয়ের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি। অসংখ্য পাইনের সারি, বোয়িং, কাচের মতো স্বচ্ছ এয়ারপোর্ট ধীরে ধীরে বিমান উড়ছে। নিচে গিস নদী, আইফেল টাওয়ার। আর আমার মনের জগৎ...।

দিল্লিতে আরো বিস্ময়। এয়ার ফ্রান্সের স্টাফরা রিটার্ন ভাড়া দাবি করছে। বললাম, নেই। এরপর জানলাম ইনডিয়াতে ডাবল এন্ট্রি ভিসা না থাকায় প্রবেশ বন্ধ। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ভেবেছি দিল্লি এসে নতুন করে সব ঠিক হবে। আমাকে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হলো। জিজ্ঞাসাবাদ। বাংলাদেশি মুসলিম, প্যারিস ফেরত। তালিবান নই তো!

অনেক চোখের পানি ফেলার পর একটা ফোন করার সুযোগ হলো। বাংলাদেশ বিমান তিন দিন পরে। খাদ্যবিহীন বাহাত্তর ঘণ্টা কিভাবে যে কাটলো! পরদিন আত্মীয়ের মাধ্যমে বিমানের স্টাফরা টিকেট দিয়ে গেল। গোয়েন্দারা আমাকে সিটে বসিয়ে তবে গেলেন। রাত আটটায় যখন বাসায় এলাম তখন সবাই চমকে গেল। ওরা জেনেছে, আমি ইওরোপে ঢুকেছি। চোদ্দ দিনের মাথায় আমি ফেরত এলাম।

আজ কষ্টের এলোমেলো জীবন। প্রবাসের চেষ্টায় যৌবনের কতোকগুলো দিন হারিয়ে গেল। প্যারিস মিশনে বড় অংকের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আজ সব শূন্য। জোট সরকারের সতেরো মাস গেল। আশার বাণী নেই। ৭ মার্চ রাতে যখন এই লেখা লিখছি, সামনে টিভির পর্দায় চোখ গেল। শফিক রেহমান নিউ ইয়র্কের হিরো শেখ সালেহ-র সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দিনের ঘটনাবলী জানা হচ্ছে। শেষে শফিকভাইয়ের জিজ্ঞাসা, পশ্চিমা দেশে যেতে হলে এ দেশের তরুণদের কি করণীয়?

উত্তরের প্রতি নজরে নেই আমার। আমি ফিরে গেলাম স্মৃতির ক্যানভাসে। দিল্লি-প্যারিস-মিউনিখ-মিলান...

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

চাচার বিয়ে

– নুরের নবী

মানুষ বলে, একটানা যে একযুগ বিদেশ করে সে আর মানুষ থাকে না। তাহলে কি হয়? গাধা, নাকি গরু?! বাস্তবে এমন প্রশ্ন কাউকে কখনো করিনি। তাই অজানা রয়ে গেল এর উত্তর।

এক যুগ বিদেশে নিজেও বাস করিনি। এই ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ আমি। কিন্তু বিধাতার বোধহয় তা সহ্য হলো না। তাই এক যুগ বিদেশ থাকলে কি হয় চোখে আঙুল দিয়ে হাতেনাতে, হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিল আমায়। মূল ঘটনা খুলে বলা যাক।

আমার এক চাচা পাক্কা তেরো বছর প্রবাসী জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরেছে। এতোদিন হাতের কাছে না পাওয়ায় হয়তো ছেলের বিয়ের বয়স পার হলেও কোনো জোর করতে পারেনি দাদি আমার। বাধ্য হয়ে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে দাদির। এখন ছেলেকে হাতে পেয়ে আর কোনো ধৈর্য সহ্য নয়, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চারদিকে ঘটক লাগিয়ে হন্যে হয়ে মেয়ে খুজে বের করতে তাগিদ দিয়েছে।

দাদির আর তর সয় না। চোখে ঘুম হয় না, অল্পদিনের মধ্যে ছেলের কপাল থেকে অবিবাহিতের সাইনবোর্ড খসাতে চায়ই চায়। সে কি তাড়াহুড়ো!

চাচা আমার ছোট–খাটো একখান ভূরিওয়ালা নাদুস–নুদুস।

নিশ্চয়ই চাচা বিদেশে বসে থেকে কাজ করেছে। না হয় বিদেশে থেকে স্বাস্থ্য এমন হয় কেমন করে? টাকা তো আর কম কামাননি। কথাবার্তার কোনো লাইন লেন্স নেই। কখন কাকে কি বলা দরকার বুঝে উঠতে পারে না। তাই প্রায় তালগোল পাকিয়ে জট লাগিয়ে ফেলে সম্পর্কের।

পোশাক আর চলাফেরারসহ কোনো কিছুতে চাচাকে স্পর্শ করতে পারেনি আধুনিকতায়! অর্থাৎ আধুনিকের *অ*–ও নেই চাচার ভেতর যেন আদিযুগের মানুষ একখান। ভাব–সাবও কেমন হাবলা ধরনের। এক কথায় বাংলার *মদন*। তেরো বছর প্রবাসে জীবন কাটালে এই হয়!

চাচার কোনো কিছুতে আধুনিকতার ধোরাছোয়া না থাকলেও চাওয়ার মধ্যে ঠিকই আছে। চাচায় একখান সুন্দর স্বাস্থ্যের রূপসী এবং শিক্ষিত মেয়ে চান। টাকা পয়সা কিচ্ছু চান না।

চাচার ইচ্ছার কথা শুনে আর আমি হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। সবার সামনে শব্দ করে হেসেই ফেললাম। এই অপরাধে সঙ্গে সঙ্গে মাঝারি ধরনের একটা ধমক দিলেন।

মনে মনে বলি, *বলদ মার্কা* লোক, তবু ইচ্ছার কি ছিরি! মেয়ের কতো গুণ চায়! ঘটকরা হন্যে হয়ে গরু খোজা খুজে মেয়েদের সন্ধান একের পর এক আনছেন আর চাচা দলবল নিয়ে দেখতে যান। কিন্তু কাজের কাজ কিচ্ছু হয় না। কারণ মেয়ে চাচার পছন্দ হলেও দুষ্টু আধুনিক মেয়েগুলো চাচাকে পছন্দ করে না। মজার ব্যাপার হলো, আজকাল মেয়েদের পছন্দ–অপছন্দকে এতো গুরুত্ব দেয় মুরুব্বিরা তা চাচার জানাই ছিল না। এবার বোধহয় জানা হলো তাও একেবারে প্র্যাকটিকাল।

এক বদসাহসী মেয়ে তো সবার সামনে নাকি বলেই ফেললো, এমন *আবুল* মার্কা লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে কে? কোন আক্কেলে? পড়ালেখা করেছি কি এমন লোকের সঙ্গে সংসার করার জন্য। মরে গেলেও এমন লোকের সঙ্গে জীবন শেয়ার করতে পারবো না।

বাড়িতে এসে এই নিয়ে কতোজনে কতো রঙ–বেরঙয়ের, তাচ্ছিল্যের হাসা হাসছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। অনেকে তো চাচার জন্য আর মেয়ে দেখতে যাবে না বলে দিয়েছে।

চাচা হতাশ হয়ে পড়লেন। কারণ অনেকগুলো মেয়ে দেখলেন। ফলে বেশ কিছু পকেটের কাচা পয়সাও খসলো।

প্রথম প্রথম অন্য এক কারণে রাগ করে চাচার সঙ্গে মেয়ে দেখতে যাইনি। পরে এমন পরিস্থিতির কারণে চাচা, দাদি আমায় বেশ করে ধরলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের জোরাজুরিতে চাচার সঙ্গে যেতে হলো। গিয়ে নিজ চোখে দেখলাম চাচার আসল রূপ। এমন জানলে মরে গেলেও চাচার সঙ্গে যেতাম না। রহস্য খুলে বলি।

এক গুণবতী মেয়েকে দেখতে গেলাম। খাওয়া–দাওয়ার পর্ব শেষে মেয়ের ছোট বোন এসে বললো, চাচার সঙ্গে মেয়ে পাশের রুমে আলাদাভাবে কথা বলবে।

চাচাকে ইশারায় যাওয়ার জন্য বললাম। কিন্তু কেন জানি চাচা আমার যায় না।

সবাই বলার পর চাচা সঙ্গে করে আমাকেও নিয়ে যেতে চান। প্রথমে যেতে চাইলাম না। কারণ মেয়ে আলাদা যখন কথা বলবে বলছে তখন চাচার সঙ্গে সেখানে আমিও বা যাই কোন আক্কেলে?

চাচা আমাকে ছাড়া ভেতরে যাবেনই না। কি আর করা! অগত্যা বাধ্য হয়ে যেতে হলো। গিয়ে দেখি মেয়ে বসে আছে চেয়ারে সাধারণভাবে। তার ছোট বোনটি চট করে বের হয়ে গেল। মেয়ের সামনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফট করে মেয়েকে সালাম দিয়ে বসলেন চাচা!

মেয়ে কতোটুকু লেখাপড়া করেছে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা চাচার। অথচ উল্টো মেয়েই চাচাকে জিজ্ঞাসা করা শুরু করেছে। *গাধার* মতো চাচাও একের পর এক উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

বলদ চাচা সঙ্গে এসে এমন *মাইনকা চিপায়* পড়েছি, বের হবো তারও কোনো উপায় কিছুই নেই! চাচার অবস্থার এমন অধঃপতন দেখে সাহস করে মেয়ের প্রশ্নের ভেতর আমার প্রশ্ন ঢুকিয়ে দিলাম।

মেয়েও লক্ষ্মী, ভদ্রমেয়ের মতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ দিকে মেয়ে যা বললো তা শুনে তো স্রেফ বেকুব হয়ে গেলাম। চাচাকে বললো, এতো দিন যখন বিয়ে করেননি, এখন করছেন কেন? অযথা অন্য একটি মেয়েকে কষ্ট দেয়া। বয়স তো কম হয়নি। বাচবেনই বা আর কয়দিন। বাকি জীবনটা একা থাকাই বেটার না? আপনার জায়গায় যদি আপনার ভাতিজা হয় তাহলে একটু ভেবে দেখতে পারি।

তিলে তিলে যত্নে গড়া ইজ্জত–সম্মান সব গেল। জলে গেল! কিছু বাকি রইলো না। মনে মনে ভাবি।

একটু ঝাঝালো কণ্ঠে তার যথাযথ উত্তর সঙ্গেসঙ্গেই মেয়েকে আমি দিয়ে দিয়েছি। বের হয়ে গেলাম চাচা–ভাতিজা দুজন। যাক, বাবা তারপরও শুকরিয়া! অপমান করলেও ভেতরে একা রুমে নিয়ে করেছে। ভাগ্যিস সবার সামনে করেনি। মেয়ে আধুনিক হলেও খুব ভদ্র। এটিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আসার সময় দোয়া–দরুদ পড়ে দুই গালে থাপ্পড়ের সঙ্গে তওবা করলাম, চাচার সঙ্গে আর কোনো মেয়ে দেখতে যাবো না।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত চাচা এক আত্মীয় মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তবে চাচার আশা কোনোটা ঠিক মতো পূরণ হয়নি। তবে যা চাননি তা পেয়েছেন। মেয়ের বাবা অনেকগুলো দামি জিনিসপত্র দিয়েছেন।

ছাগলনাইয়া, ফেনী থেকে

প্রবাসে দুই মাস

– গালিব

১৯৯৯–এর জুলাইয়ের কোনো এক সকালে বাবার সঙ্গে আঠারো বছরের আমি রওনা দিলাম ইনডিয়ার উদ্দেশ্যে। নতুন দেশ দেখার আলাদা একটা উত্তেজনা কাজ করছিল আমার ভেতর। বাংলাদেশের মাত্র দুই তিনটা শহর দেখা এই আমি যাচ্ছি সম্পূর্ণ নতুন একটি দেশে ভাবতেই কেমন যেন গর্বে ভরে উঠেছিল আমার বুক। এ রকম সৌভাগ্য কয়জনের হয়।

বেনাপোল সীমান্তে সব কাগজপত্র ঠিক করে পাসপোর্টে সিল নিয়ে আমরা যখন বাংলাদেশ বর্ডার পার হলাম তখন ঘড়িতে বেলা সাড়ে এগারোটা। ইনডিয়ার হরিদাসপুর সীমান্তে আমরা একটি মানি এক্সচেঞ্জ দোকানে বসে আমাদের খুচরা বাংলাদেশি টাকা পাল্টিয়ে নিলাম এবং ঘড়ির কাটা আধা ঘণ্টা পিছিয়ে দিলাম। মানি এক্সচেঞ্জের পাশেই একটি হোটেলে আমরা ভাত খেলাম। রুই মাছ, নিরামিষ ঘণ্ট ও ডাল দিয়ে। বিল দিতে গিয়ে সত্যিই অবাক হলাম। আমাদের বিল হয়েছিল মাত্র ষোল টাকা। অর্থাৎ শুধু মাছের দাম আট টাকা করে নিল।

হরিদাসপুর সীমান্ত থেকে আমরা একটি ভ্যান রিজার্ভ করে বনগাও রেল স্টেশনে পৌছালাম। ছোট্ট একটি স্টেশন। মাত্র তিনটি প্ল্যাটফর্ম। টিকেট ঘর থেকে জানিয়ে দিল তিন নাম্বার প্ল্যাটফর্মে শিয়ালদগামী ট্রেন এসে থামবে। আমরা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে গিয়ে কংকৃটের বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর অর্থাৎ একটার দিকে ট্রেন এলো। ট্রেনে মোটামুটি বেশ ভিড়। তবে আমরা দুজন বসার জায়গা পেয়েছিলাম। দুই তিন স্টেশন পর থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড ভিড় আমাদের দেশের লোকাল বাসগুলোর মতো। এখানে একটা জিনিস দেখলাম। ছেলেমেয়ের কোনো পার্থক্য নেই। যে যেখানে জায়গা পাচ্ছে, বসে পড়ছে বা দাড়াচ্ছে। পাশে ছেলে না মেয়ে তা তাকিয়ে দেখারও কারো সময় নেই।

লোকাল ট্রেনে জার্নি করা যে এতো বোরিং তা কিছুক্ষণ পর টের পেলাম। শ্রাবণের ভ্যাপসা গরমে গাদাগাদি করা ট্রেন যখন প্রত্যেক স্টেশনে দাড়াচ্ছিল তখন গরম ও ভিড়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার জার্নি শেষে আমরা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছালাম। বগি থেকে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। স্টেশনের টিনের ছাদ ছিল এতো উচুতে যা আমার ধারণার বাইরে। তার নিচে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাজার মানুষের স্রোত। চারদিকে তাকানোর আর সুযোগ পেলাম না। ভিড়ের ধাক্কায় আমরাও হাটতে লাগলাম। ঠিক কোনদিকে যাচ্ছি বুঝতে পারলাম না। কারণ সামনে ও পেছনে শুধু চলমান মানুষ। এক ট্রেনে এতো মানুষ থাকে তা ছিল আমার ধারণা বাইরে। একটু পরে নিজেকে খোলা আকাশের নিচে দেখে বুঝলাম স্টেশনের বাইরে চলে এসেছি। কাছেই ট্যাকসি স্ট্যান্ড থেকে ট্যাকসিতে উঠলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর ট্যাকসি কলকাতা শহরে ঢুকলো।

প্রথম দৃষ্টিতেই কলকাতা আমাকে হতাশ করলো। কলকাতা সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিল তার প্রমাণ বাস্তবে মিললো না।

আব্বা সম্ভবত আমার মুখ দেখে বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, কি, একদম ঢাকা?

আসলেই আমাদের ঢাকার থেকে কলকাতার সে রকম কোনো পার্থক্য খুজে পেলাম না শুধু ট্রাম ছিল নতুন আর রাজপথে ছিল না কোনো রিকশা।

খিদিরপুর এলাকায় আমরা একটি গেস্ট হাউসে উঠলাম। এখানেই হালকা নাশতা করে আমরা চলে গেলাম পূর্ব নির্ধারিত ডাক্তারের ক্লিনিকে যা ছিল গেস্ট হাউসের কাছেই। এই ক্লিনিক থেকেই আমাদের এক নিকট আত্মীয় তার চিকিৎসা করে গিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে তার লেখা একটি চিঠি ছিল। এই চিঠি নিয়ে আমরা ডা. গুপ্তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন এবং পরের দিনই ক্লিনিকে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

পরের দিন গিয়ে ক্লিনিকে ভর্তি হলাম। আমার সিট হলো পাচ তলার পাচশ দশ নাম্বার বেডে। এ বেডেই আমার প্রবাস জীবনের পরবর্তী দুই মাস কাটিয়েছিলাম।

পাচ তলায় আমার বেডে যখন এলাম তখন প্রায় দুপুর। এক সিস্টার এসে প্রেশার ও টেম্পারেচার মাপলেন। বললো এখনই দুপুরের খাবার দেবে, খেয়ে নিও।

আগের দিন প্রায় সারা দিন জার্নির পর গোসল করিনি। তাই ভাবলাম এখন গোসল করে নিই।

সিস্টারকে গোসলের কথা বলতেই সিস্টার খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, গোসল কি?

এটা কি অজ্ঞতা, না উদাসীনতা বুঝতে পারলাম না। বললাম, *সিস্টার, চান করবো।*

তখন তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, ওই হাসিতেই বুঝে গেলাম এ হাসপাতালে যতোদিন আছি ততোদিন আমাকে পানি, না জল খেতে হবে।

তবে হাসপাতালে সবার ব্যবহার ছিল খুবই আন্তরিক। প্রত্যেক পেশেন্টকেই খুব কেয়ার করতো। আমার ওয়ার্ডে ছিল মোট পনেরোটি বেড। আমাদের দেখাশোনা করার জন্য দুইজন বুয়া যাদেরকে মাসি বলা হয় তারা ছিল দুজন দুই শিফটে। এছাড়া চারজন বয় থাকতো। এরা সর্বক্ষণ ওয়ার্ডে অবস্থান করতো এবং পেশেন্টের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতো। তবে তাদের সঙ্গে খুব মেপে মেপে কথা বলতাম। আঞ্চলিক টানে কথা বললে যদি আবার ওই হাসি দেখতে হয়! এটাকেই বুঝি বলে হীনমন্যতা।

ক্লিনিকে আব্বার সঙ্গে দেখা হতো চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র তিন ঘণ্টা। সকালে দশটা থেকে এগারোটা এবং বিকাল পাচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত। এর বাইরে পেশেন্টের অবস্থার গুরুতর অবনতি না হলে দেখা করার অনুমতি মিলতো না। একটি বিছানায় সারা দিন শুয়ে থাকতে হতো। মুখ বুজে সব যন্ত্রণা সহ্য করতাম। কারণ অপারেশন হয়ে গেলেই আমি হয়ে যাবো সুস্থ, স্বাভাবিক। আব্বা অবশ্য সকালে দৈনিক *আনন্দবাজার* ও

আজকাল দিয়ে যেতেন। তবে দুটো পত্রিকারই পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট এবং অধিকাংশ খবরই থাকতো পশ্চিমবঙ্গের। আধা ঘণ্টাতেই পত্রিকা দুটো পড়া হয়ে যেতো। বাংলাদেশের সে রকম কোনো খবর থাকতো না। কবি সুফিয়া কামালের মৃত্যুর সংবাদ দেখেছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার ভেতরের পাতায় আট দশ লাইনে। এছাড়া বাংলাদেশের হরতালের একটি ছবি দেখেছিলাম আজকাল পত্রিকায়। বাংলাদেশের অন্য কোনো খবর এ দুই মাসে দেখিনি।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তিন দিন পরে আমার পায়ে অপারেশন হলো। পায়ের পাতা থেকে কোমর পর্যন্ত প্লাস্টার নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ছিল অসম্ভব কষ্টকর। নিজের প্রতিটি কাজেই সাহায্য দরকার হচ্ছিল মাসির অথবা বয়ের। আমার বেডের মাথার কাছে ছোট্ট একটি জানালা ছিল যা দিয়ে শুধু এক টুকরো আকাশ দেখা যেতো। বিকেল হলেই সেই আকাশে উড়তো অসংখ্য রঙের ঘুড়ি। ঘুড়িগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগতো।

অপারেশনের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে সকাল বেলায় আব্বা হঠাৎ করে একটি ছোট রেডিও এনে আমার হাতে দিলেন। আমি যে প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলাম আব্বা কিভাবে টের পেলেন তা বুঝতে না পারলেও রেডিও পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। এরপর রেডিওটাই হয়ে উঠলো আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। কলকাতার *এফ.এম* চ্যানেলটি ছিল এক কথায় অসাধারণ। চব্বিশ ঘণ্টা লাইভ অনুষ্ঠান প্রচার করতো। ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে দুই ঘণ্টা করে পর্যায়ক্রমে গান প্রচার করতো। যে কোনো সময় স্টুডিওতে ফোন করে নির্দিষ্ট কোনো গানের অনুরোধ অথবা উপস্থাপকের সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পেতো শ্রোতারা। উপস্থাপকও বেশ সুন্দরভাবে প্রত্যেক শ্রোতার সঙ্গেই আলাপ করতেন। কাজেই রেডিও পাওয়ার পর সময় কাটাতে খুব একটা সমস্যা হলো না।

তবে মাঝে মধ্যে মন খুব খারাপ হয়ে যেতো, বিশেষ করে মায়ের জন্য। মনে হতো এখানে যদি আমি মারা যাই তাহলে আর মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না। দেখা হবে না কতো প্রিয়জনের সঙ্গে। যদিও আমার যে অসুখ তাতে মারা যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। খুব বেশি ক্ষতি হলে একটা পা হয়তো হারাবো। কিন্তু সে সময়ে এ ধরনের কোনো যুক্তিই মনে আসতো না।

একদিন এ ধরনের ভাবনার সময় হঠাৎই চোখ দিয়ে পানি পড়ে যায়। দেখতে পায় এক সিস্টার। সিস্টারের সে কি আক্ষেপ! কি রে (ততোদিনে সম্পর্ক তুমি থেকে তুই তে নেমে এসেছে) আমরা তোকে খুব কষ্ট দিচ্ছি, না! কয়েকদিন পরেই তোর ছুটি হবে। এক দৌড়ে মায়ের কাছে চলে যাবি।

সিস্টার এমন আপন ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন যে, কান্নার জন্য নিজেই খুব লজ্জা পেলাম। মিথ্যা করে বললাম, দিদি, পায়ে খুব ব্যথা করছে।

তবে সিস্টার মনে হয় বুঝতে পেরেছিল মিথ্যা বলছি। তাই ব্যথার কোনো খোজ না করে তিনি আরো খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।

ডাক্তার যেদিন বললেন আগামী পরশু তোমার রিলিজ দেবো সেদিন মনে হয়েছিল, এর চেয়ে ভালো খবর আমাকে কেউ কোনোদিন দেয়নি। অধীর আগ্রহে সেদিন আব্বার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম।

আব্বা বলেছিলেন, পরশু রিলিজ দেয়ার পর দুই দিন রেস্ট হাউসে থেকে কলকাতা শহরটা একটু ঘুরে দেখো, তারপর না হয় যাই। কিন্তু আমি তীব্র আপত্তি জানালাম। আসলে আমার আর এক মুহূর্তও তখন সেখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। মাত্র দুই মাস নিজের মা, নিজের দেশ ছাড়া থাকা যে এতো কষ্টকর তা ততোদিনে বুঝে গেছি। যেসব প্রবাসী ভাইয়েরা বছরের পর বছর প্রিয়জনের সান্নিধ্য ছাড়া প্রবাসে বসবাস করছেন তাদের কষ্ট সামান্যতম হলেও আমি ওই দুই মাসে তা উপলব্ধি করেছিলাম।

এর মধ্যে ক্লিনিকের বিল পরিশোধ নিয়ে আব্বা সমস্যায় পড়লেন। আমাদের ভিসার মেয়াদ ছিল এক মাস। কিন্তু দুই মাস থাকতে হলো বলে ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হয়েছে। তাছাড়া টাকা যা ছিল তাও প্রায় শেষ। বিল যা হলো তার অর্ধেক ওই টাকায় শোধ করা যায়। আব্বা কোনো উপায় না দেখে ক্লিনিকের মালিকের কাছে

বিষয়টি খুলে বললেন। আব্বাকে অভয় দিয়ে মালিক বললেন, আপনি যতোটুকু পারেন দিয়ে যান, বাকিটা দেশে গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। একজন প্রায় অপরিচিত এবং অপর দেশের লোককে তিনি এতো টাকা কি বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দিলেন জানি না। আমরা দেশে এসে অবশ্য টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

ফরিদপুর থেকে

কান্না হাসি

– মোহাম্মদ ইমরান হুসাইন

প্রেমের জন্য মানুষ অনেক কিছু বিসর্জন দেয় যা শুনে এসেছি এতোদিন। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম সেদিন। আমার পরিচিত একটি ছেলে যে তার প্রেমিকার জন্য মা-বাবাকে ছেড়ে এখন ঘরজামাই হিসেবে শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করছে।

তাহলে ঘটনাটি খুলেই বলি। তাহের নামের সুদর্শন পরিচিত এই তরুণটি প্রেমে পড়ে যায় তার পাশের বাড়ির এক মেয়ের। একজন আরেকজনকে না দেখে থাকতে পারে না এমন অবস্থা। আস্তে আস্তে খবরটা মায়ের কানে আসে। ওইদিকে বাবা তার ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ছেলে তো জানতে পেরে চিন্তায় পড়ে যায়।

মা এ সময় ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করে। ছেলে প্রেমের ব্যাপারটা বার বার অস্বীকার করে। ছেলে আর মেয়ের বাড়ি ছিল দেয়ালের এপাশ এবং ওপাশ। এই দেয়াল গড়ে ওঠা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে *সাপে-নেউলে* সম্পর্ক। এমন সম্পর্কের মাঝে ছেলে-মেয়ের এই প্রেমের সম্পর্কটা আশপাশের মানুষের কাছে খুব মজার ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। ছেলে আমাকে বড় ভাই হিসেবে একদিন সব খুলে বলে। আমি দুই পরিবারের *দা-কুমড়া* সম্পর্কের কথা ভেবে ছেলেকে বলি, সে যেন মেয়েটিকে ভুলে যায়। তার মাও আমাকে বোঝানোর জন্য অনুরোধ করে। সেই থেকে টানা দুই মাস ওয়াজ নছিহত, উপদেশ দিয়েও তাকে ফেরাতে পারলাম না। এক সময় ছেলেটি তার প্রেমের ব্যাপারে মায়ের কাছে চুপ থাকতো আর বাবার কাছে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতো।

বাবা ধার-দেনা করে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করলেন। ছেলেও যেতে রাজি হলো। কিন্তু যাবার সময় যতোই কাছে আসতো ততোই সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। অবশেষে খুশি মনে সে যাওয়ার প্রস্তুত নিল। বিদায়ের দিনে তার মা তার অগোচরে ব্যাগ থেকে মেয়ের একটি ছবি বের করে এবং তা নিয়ে শুরু হয় লংকাকাণ্ড।

ছেলের বাবা বলে এখনই এই ছবি ছিড়ে ফেলতে হবে। ছেলে বলে, আমার অগোচরে তোমরা ব্যাগে হাত দিয়েছো কেন। চিৎকার আর কান্নাকাটির এক পর্যায়ে ছেলেকে বাবা মারধর শুরু করে। ছেলে সউদি যাবে না বলে পাসপোর্ট ভিসার কাগজ ছুড়ে মারে। আমি বুঝিয়ে সবাইকে শান্ত করি এবং এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হই। এয়ারপোর্টে এসে জানতে পারি, তার ফ্লাইট দুই দিন পর।

দুই দিন পর সে সউদি আরবের উদ্দেশ্যে বিমানে যাত্রা করে। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর দুই পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া লেগেই থাকতো। ছেলের মা-বাবা খোজ নিতো মেয়ে চিঠিতে যোগাযোগ রাখে কি না। এ জন্য প্রবাসী চাচাকে দেশ থেকে যাওয়া চিঠিগুলো চেক করে ছেলের হাতে দিতে বলতেন।

এভাবে কয়েক মাস গত হলো, ছেলের খবর পেতাম না। কিন্তু দুই পরিবারের অশান্তির খবর প্রতিদিনই শোনা যেতো। এর মধ্যে জানতে পারলাম ছেলেটি বিদেশ যাওয়ার আগে তার প্রেমিকাকে বিয়ে করে গেছে। ঘটনাটি সেই মার খাওয়ার দিনই সে ঘটিয়েছে। দশ মাস পর ছেলেটি দেশে ফিরে আসে এবং শ্বশুরালয়ে গিয়ে ওঠে।

আমি মাঝে মধ্যে ছেলেটির বাড়িতে যাই। গিয়ে শুনতে পাই তার মায়ের চাপা কান্না এবং দেয়ালের ওই পাশ থেকে শোনা যায় খিল খিল হাসি।

ঢাকা থেকে

লালবাগ, ঢাকা থেকে

টেলিফোন সার্ভিস

– মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

জাপানিজদের সহজ–সরল মন এবং সত্য ভাষী ও পরোপকারী মনোভাবের কথা হয়তো শুনে থাকবেন। তাদের নিত্যদিনের অভিবাদনগুলো খুবই চমৎকার। সকালে দেখা হলে বা অন্য যে কোনো সময়ে দেখা হলে ভিন্ন ভিন্ন অভিবাদন আছে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ও ঘরে ফেরার সময়, বিভিন্ন জাতীয় উৎসবে, এমনকি নতুন বছরের জন্যও নির্ধারিত অভিবাদন রয়েছে এবং সর্বোপরি মাথা নিচু করে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সত্যিই শেখার মতো।

আমাদের বাংলা ভাষায় এতো অভিবাদন নেই, কিছু থাকলেও দুই তিনটি ছাড়া কেউ ব্যবহারও করে না। ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাওয়া এবং উপকৃত হলে বার বার ধন্যবাদ দেয়া তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট যা আমাদের মধ্যে এখনো ভালো ভাবে গড়ে ওঠেনি।

একবার দেশে টেলিফোন বুথ থেকে মায়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছিলাম। তাদের দেশে কিছুদূর পর পর জনসমাগম হয় এমন জায়গায় পাশাপাশি একটি থেকে দশটি পর্যন্ত টেলিফোন বুথ রয়েছে। সারা দেশব্যাপী যা বেষ্টিত। সেখানে লোকাল ও আন্তর্জাতিক ফোন আছে এবং সেগুলো কয়েন বা টেলিফোন কার্ড ব্যবহৃত হয়।

ওই দিন আকাশ তেমন ভালো ছিল না। ঝড়ো হাওয়া বইছিল। এ অবস্থায় লাইন সংযোগ পেয়ে আবার কেটে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কার্ডটি থেকে কল দ্রুত কমে যাচ্ছে। তাই বুথ থেকে বের হয়ে বাসায় যাবো এমন সময় সেখানে রিং হলো।

আমি তো অবাক। কারণ বুথ থেকে তো বাইরে ফোন করা যায়, এখানে আবার রিং হয় তা আমার জানা ছিল না। তাই দাড়িয়েছিলাম কিছু সময়। লক্ষ্য করলাম, আমার ফোন করা নির্দিষ্ট ফোনেই রিং হচ্ছে। রিসিভার তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এপাশ থেকে এক ভদ্রমহিলা জানালেন, তুমি তোমার দেশে ফোন করার চেষ্টা করছিলে। কিন্তু কথা বলতে পারোনি। অথচ তোমার কার্ড থেকে অনেকগুলো কল চলে গিয়েছে। তোমার ঠিকানা বলো, তোমাকে নষ্ট হওয়া কলের সমপরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ তাদের মুদ্রা ইয়েন) তোমাকে ফেরত দেয়া হবে।

আমি তো এই কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। বার বার নিষেধ করলাম। মহিলা নাছোড়বান্দা। ঠিকানা এবং ব্যাংকের একাউন্ট নাম্বার দিয়ে দিলাম। তিন দিন পর দেখি, একটি চিঠি এসেছে জাপানের রাষ্ট্রীয় টেলিফোন সংস্থা *এনটিটি* থেকে। সেখানে আমাকে তিনশ পঞ্চাশ ইয়েন একাউন্টে দিয়েছে এবং ওই দিন সংযোগ না দিতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করেছে।

তাদের ভাষায় লিখিত চিঠিটি সযত্নে এখনো সংরক্ষণ করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। পাঠক বলুন তো, এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের দেশের টিঅ্যান্ডটি–র কোনো তুলনা চলে কি না?

তবে আমি আশাবাদী, একদিন হয়তো আমাদের আচার–আচরণের পরিবর্তন ঘটাবো বিশ্বায়নের এই যুগে এবং সংস্কৃতির নিয়ম অনুযায়ী ভালোটা গ্রহণ, খারাপটা বর্জনের মাধ্যমে। তখন ব্যক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিস ও সংস্থায়ও পরিবর্তন হবে। এ জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং জ্ঞানের চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

অমৃতা

– অমিত আহসান

পরিচয় পচাশির ডিসেম্বরের কোনো এক দুপুরে। দারুণ মিষ্টি মেয়েটি। শুধু আদলে নয়, আচার ব্যবহারেও। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইংরেজিতে অনার্স পড়ছে আর আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড ইয়ারে।

আমরা খুব সহজেই বন্ধু হলাম। সত্যিকারের নির্ভেজাল বন্ধু। প্রায়ই কথা হতো ফোনে। দেখা হতো মাসে দুই একবার। আলাপচারিতার বিষয় ছিল সাহিত্য, চলচ্চিত্র, পারিপার্শ্বিক, দৈনন্দিন ঘটনা এবং স্বভাবতই এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত খুটিনাটি। এ রকমই চলছিল বেশ কয়েকটা বছর। আমরা কখনোই প্রেম করিনি। কিন্তু খুব সন্তর্পণে হলেও কেমন যেন এক ধরনের নির্ভরতা জন্মেছিল উভয়ের মধ্যেই। আমার কোনো পরীক্ষা খারাপ হলে প্রথমেই ওকে ফোন করতাম এবং জানতাম সে বলবে চিন্তা করিস না। দেখিস, পরেরটা ভালো হবে। ব্যস, আমি ঠাণ্ডা।

একদিন খুব মন খারাপ করে ফোন করলো, জানিস, আমার মিশকাটা দুদিন ধরে কিছু খাচ্ছে না। কি করি বলতো?

মিশকা ছিল তার পোষা তিনটি বিড়ালের একটি। বেড়ালগুলো তার এতোই প্রিয় ছিল যে, মাঝে মধ্যে আমারও হিংসা হতো। পরের দিনই হয়তো ফোন করে খুচিয়েছি, কি, আমার প্রতিপক্ষরা ঠিকমতো খাওয়া–দাওয়া করেছে আজ?

ঢাকায় কৃকেট খেলা দেখেছি এক সঙ্গে। দেখেছি পাবলিক লাইব্রেরি কিংবা বৃটিশ কাউন্সিলে মুভি। ঝগড়া করেছি কারণে–অকারণে। কঠোর সমালোচনা করেছি তার লেখা ইংরেজি কবিতা পড়ে। সেও কম রসিকতা করেনি আমার ছোট গল্প লেখার দুঃসাহসিকতা দেখে। অনেকের চোখেই আমরা একটা ঈর্ষণীয় জুটি ছিলাম পরে জেনেছি।

একদিন ইউনিভার্সিটির জীবন শেষ হলো অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আমরা তখনো একে অপরের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। শুরু হলো চাকরি খোজা।

সব সময় সে বলতো, তুই জীবনে খুব বড় হবি। সাকসেসফুল হবি।

তার দোয়ায় কি না জানি না, আমি ঠিকই খুব ভালো একটা চাকরি পেলাম একটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থায়।

সে ঢুকলো একটা এনজিও–তে।

উভয়ের কর্মব্যস্ততার কারণে দেখা হতো কম। কিন্তু কথা হতো অনেক। আমরা দুজনেই যায়যায়দিনের পোকা ছিলাম। প্রতিটি সংখ্যা আদ্যন্ত শেষ করে তার ভালোলাগা–মন্দলাগাগুলো দুজনে শেয়ার না করা পর্যন্ত শান্তি পেতাম না। দুজনের ভালোলাগা, মন্দলাগাগুলো এমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেতো যে, মনে হতো উই ওয়্যার মেড ফর ইচ আদার।

১৯৯২ সাল। বয়স বাড়ছিল দুজনেরই। বিয়ের ব্যাপার তার ওপর স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক চাপ ছিল। কিন্তু ও যে ততোদিনে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

আর আমি! করলাম আমার জীবনের সবচেয়ে বড় হিসাবের গরমিল। পাঠকের তীব্র ঘৃণা এড়ানোর জন্য একটু খুলেই বলি। আমি ছিলাম একটি টিপিকাল মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে। আগাগোড়া ভালো ছাত্র। দেশের সবচেয়ে ভালো স্কুলে, তারপর সবচেয়ে ভালো কলেজে এবং এরপর বুয়েট সব কিছু ছিল ছকে বাধা। এসব কিছুই ছিল আমার বাবা মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফসল যা তাদের কাছে আমাকে করেছিল চিরঋণী। আমাকে নিয়ে তাদের তখন কতো সব পরিকল্পনা, কতো স্বপ্ন! কখনোই আমার চাওয়া–পাওয়াকে তাদের চাওয়া–পাওয়ার চেয়ে বড় করে দেখিনি। সে কারণেই সেদিন তার প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারিনি।

একদিন কোনো এক কথার ফাকে বলে দিয়েছিলাম, আমাদের মধ্যে নির্ভেজাল বন্ধুত্বই থাক। ভালো বন্ধুই যে ভালো দম্পতি হবে তার গ্যারান্টি কি!

অসম্ভব ম্যাচিওরড মেয়ে ছিল সে। কষ্ট পেলেও নিজেকে সুন্দর গুটিয়ে ফেলেছিল। তাকে ঠকালাম কি না জানি না তবে নিজেকে ঠকিয়েছিলাম নিশ্চিত।

১৯৯৩ সাল। হঠাৎ একদিন ফোন এলো, কিরে, একদম লাপাত্তা? খুব ব্যস্ত থাকিস বোধহয় আজকাল। তুই তো এখন বিগ বস। তার কথায় নালিশের সুর ছিল।

না–রে অফিসে একটু কাজের চাপ ছিল। কেমন আছিস তুই? অনেক দিন তোকে দেখি না। আমার কথায় জড়তা ছিল এক ধরনের অপরাধ বোধের।

আমাকে দেখে কি হবে, শাবানা আজমীকে দেখবি কি না বল?

বুঝতে মোটেই কষ্ট হয়নি যে, মঞ্চনাটক *তুমহারি অমৃতা*–র বলছে। ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে তখন ফারুক শেখ আর শাবানা আজমীর সাড়া জাগানো নাটক মঞ্চস্থ হবার কথা। এক কথায় রাজি হয়ে ছিলাম। শুধু রাজি কি, ঝাপিয়ে পড়েছিলাম টিকেটের সন্ধানে।

তুমহারি অমৃতা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। নাটকটির অসাধারণত্ব ছাড়াও সেটা ছিল তার সঙ্গে আমার সুন্দরতম সময় কাটানোর এক অসামান্য সুখ স্মৃতি।

নাটক দেখার পর তাকে বাড়িতে নামিয়ে দেয়ার পথে একটু ইতস্ততার সঙ্গেই বলেছিল, একদিন কিছুটা সময় বের করতে পারবি? সারাটা দিন কোথাও ঘুরে বেড়াবো এক সঙ্গে।

শিওর, খুব শিগগিরই তোকে জানাচ্ছি। জবাব দিয়েছিলাম।

তারিখটা মনে নেই। সকাল সকাল তাকে পিক করে সোজা চলে গিয়েছিলাম শহরের কোলাহলের একদম বাইরে। খুব কাছাকাছি, খুব পাশাপাশি ছিলাম সারা দিন, একটা নদীর পাড়ে, খোলা আকাশের নিচে। কথা–বার্তা হয়েছিল খুবই কম। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল তাকে দেখতে যদিও মনটা যে ভালো নেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল পরিষ্কার। তাকে একদৃষ্টিতে দেখছিলাম এবং ভাবছিলাম কোন হিসাবে আমি পেয়েও হারাচ্ছি এই অপূর্ব মানুষটাকে।

আমি কিছু একটা বলতে যাবো – সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, শোন, তোকে একটা কথা বলার আছে। আমার এক ফুপাতো ভাই বিলেতে বড় হয়েছে, বিলেতেই থাকে। আমাকে খুব পছন্দ করে। আমি কখনোই সেভাবে ভাবিনি। অবশ্য তার কথা হলো যে, বিয়ে করলে সে আমাকেই করবে। সম্ভবত আমাকে খুব ভালোবাসে একতরফা – ঠিক যেমন আমি তোকে ভালোবাসি একতরফা। কয়দিন ধরে তাই ভাবছি, বিয়ে যদি করতেই হয়, এমন কাউকেই করা উচিত যে আমাকে ভালোবাসে। ঠিক কি না বল?

বিলেতে বড় হয়েছে। তোর একটু খোজখবর নেয়া উচিত না? তাছাড়া তোকে বুঝবে তো? মানে, তোর কোনো অনাদর হবে না তো? একটা অজানা ভাবনা থেকে কথাগুলো বলে ফেলেছিলাম।

থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর কনসার্ন। বলেই সে উঠে দাড়িয়েছিল। চল, অনেক বেলা হলো। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

আমিও কথা বাড়াইনি। সত্যি বলতে কি, কোনো কথা খুজে পাইনি। শুধু বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রথমবারের মতো কপালে একটি চুমু দিয়েছিলাম।

বিলেত যাবার দিন তার পরিবারের অন্যদের সঙ্গে আমিও এয়ারপোর্টে ছিলাম। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। টের পাচ্ছিলাম আমিও তাকে কতোখানি পাগলের মতো ভালোবাসি। তখনও হয়তো তাকে ফেরানো যেতো। কিন্তু সে রকম নাটক করারও সৎসাহস হয়নি। নিজের চরম কাপুরুষতায় নিজেই বোধ করছিলাম ধিকৃত। এক সময় সে মিলিয়ে গেল আকাশে আর আমার হৃৎপিণ্ডে তৈরি হলো একটি চিরস্থায়ী ক্ষত।

২০০৩ সাল। দশটি বছর পার হয়ে গেছে। বিয়ে করেছি, বাবা হয়েছি। দেশে-বিদেশে কাজ করে আবার দেশে ফিরেছি। জীবনের কোনো স্বাদ-আহ্লাদই অপূর্ণ থাকেনি। তাই বলে একটি মুহূর্তের জন্যেও আমার ভালোবাসাকে ভুলে থাকিনি। আগলে রেখেছি ঠিক যক্ষের ধরনের মতো। প্রতিনিয়ত আমার প্রার্থনা, সে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ হয়। তার সুখী হওয়াটা জরুরি। সে যতো সুখী হবে ততোই আমার কষ্টটা লাঘব হবে। আমি খোজ নিয়ে জেনেছি সে ভালো আছে। সে আরো ভালো থাকুক। তাকে ভালো থাকতেই হবে না হলে আমার ভালোবাসা হবে মিথ্যা।

আমি এখনো তাকে পাগলের মতো ভালোবাসি। পাঠক হয়তো বলবেন, কি লাভ? এটা লাভ-লোকসানের হিসাব নয়। আমি তাকে ভালোবাসি। এটা আমার মানব অধিকার। চিরকাল ভালোবাসবো তাকে ঠিক যেমনটি ভালোবাসি আমার পরম প্রিয়জনদের। এটা নিছক নর-নারীর প্রেম নয়। এটা সহজ-সরল ভালোবাসা যে ভালোবাসা তার ভালোবাসার মানুষের নিঃস্বার্থ শুভকামনায় থাকে সর্বক্ষণ বিভোর, যে ভালোবাসা ভরপুর হয় তার ভালোবাসার মানুষের সুখে আর ব্যথিত হয় তার অসুখে, যে ভালোবাসা শুধু দিতেই জানে, নিতে জানে না।

তবে হ্যা, মাঝে মধ্যে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে আমার কথা তার কখনো মনে পড়ে কি না। একবারও কি তার মন চায় না জানতে কেমন আছি আমি? প্রথম দিকে তার দুই একটি চিঠি পেয়েছি। নতুন সংসার, নতুন দেশ এবং নতুন অভিজ্ঞতার কথা। এরপর আর পাইনি। নিশ্চয়ই বিলেতের ব্যস্ত জীবনস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে। কিন্তু এও কি সহজ জীবনের এতোগুলো বছরের এতোগুলো স্মৃতি মন থেকে উপড়ে ফেলা? কাউকে একবার সত্যিকারের ভালোবাসলে একদিন কি সেই ভালোবাসাকে বাস্তবতা ও লৌকিকতার দোহাই দিয়ে বেমালুম ভুলে যাওয়া যায়?

এ কোন প্রবাসে হারিয়ে গেল আমার অমৃতা?

ঠিকানাবিহীন
amit_ahsan2000@yahoo.com

পাঠানের কবলে

- মোহাম্মদ সেলিম তালুকদার

ঘটনাটি ১৯৯৯ সালের দিকে তখন আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে কর্মরত। একদিন আমরা তিন বন্ধু ঠিক করলাম শারজাহ-তে পাকিস্তান বনাম ইনডিয়ার খেলা দেখবো। ট্যাকসি ক্যাবে স্টেডিয়ামে যাচ্ছিলাম। ট্যাকসি ড্রাইভার ছিল পাকিস্তানি পাঠান।

তিন বন্ধু ট্যাকসিতে আরামে বসে গান ধরলাম। পাঠানের তা পছন্দ হলো না। পাঠান তার ক্যাসেট প্লেয়ারে পশতু গান চালু করে দিল। পাঠানদের ভাষা পশতু।

আমরা পাঠানকে অনুরোধ করলাম পশতু গানের ক্যাসেট বন্ধ করার জন্য।

পাঠান তখন বললো, আগে তোমরা বাংলা গান গাওয়া বন্ধ করো।

বুঝতে পারলাম আর কিছুক্ষণ তর্ক করলে পাঠানের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে। আমরা বাধ্য হয়ে গান গাওয়া বন্ধ করলাম। এবং মনে মনে পাকিস্তানিদের ওপর ঘৃণার পরিমাণ বেড়ে গেল।

বাদল বললো, শালার পাকিস্তানিরা আসলে একটা গোয়ারের জাত।

১৯৭১ সালের কথা আমার মনে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর বন্ধু ইউসুফ বললো, শালা আস্ত একটা...দির পুত।

এ কথা বলতেই আমরা তিন বন্ধু হেসে উঠলাম। আমাদের হাসতে দেখে পাঠানে মহা রেগে গেল। পাঠান আচমকা বলে উঠলো, তোমরা আমাকে গালি দিয়েছো।

আমরা সবাই আশ্চর্য হলাম। পাঠান কিভাবে বুঝতে পারলো?

গাড়ি শারজাহ রোলা নামে জায়গায় এসে বন্ধ করে দিল।

গাড়ি বন্ধ করার কারণ জানতে চাইলে পাঠান বললো, তোমরা যে আমাকে... দির পুত বলেছো তার অর্থটা আগে তোমাদের কোনো বাঙালি ভাইকে জিজ্ঞাসা করবো, তারপর অন্য কথা। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, আমরা পড়ে গিয়েছি মহা ঝামেলায়। পাঠানকে আমরা বোঝাতে লাগলাম, আসলে এটা কোনো গালি নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

ইউসুফ ছিল এক মুক্তিযোদ্ধার ছেলে। সে পাকিস্তানিদের খুব ঘৃণা করতো। ইউসুফ বললো, গালি দিয়েছি তো কি হয়েছে?

ইউসুফকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম পাঠানকে বললাম, দেখো, অহেতুক তর্ক করে লাভ নেই।

কিন্তু পাঠান নাছোড়বান্দা। সে বললো, সামনে চলো, যেখানে তোমাদের বাঙালির দোকান আছে সেখানে জিজ্ঞাসা করবো,... দির পুত কথার মানে কি?

ইউসুফকে বললাম, তোর কি দরকার ছিল তাকে গালি দেয়ার?

ইউসুফ বললো, বেটা ১৯৭১ সালের পরাজিত জাত। তাদের ভয় করবো কেন?

বাদল ছিল একটু ভীতু। সে বললো, দোস্ত, এখন কি হবে?

ইউসুফ বললো, তুই একটা আস্ত ভীতু।

যাক, কি আর করা! গেলাম একটা বাঙালির রেস্টুরেন্টের সামনে।

দোকানদারকে পাঠান বললো, ভাই তোমাদের এই বাঙালি ভাই আমাকে... দির পুত বলেছে, তার মানেটা কি?

দোকানদারকে বাদল ইশারা করলো একটু ভিন্নভাবে তাকে বোঝানোর জন্য।

আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দোকানদার বললো, ড্রাইভার সাহেব, আপনি অহেতুক রাগ করছেন। আসলে লম্বা লোকদেরকে আমাদের দেশে... দির পুত বলে।

এই কথা শুনে পাঠান বললো, তাহলে তো তোমরা আমাকে গালি দাওনি, আমি ভুল বুঝেছিলাম।

পাঠান আবার বললো, *ভাই, হাম কেয়া... দির পুত হ্যায়। হামারা বড়া ভাই জিয়াদা... দির পুত হ্যায়।*

অর্থাৎ আমি আর কি লম্বা? আমার চেয়ে আমার বড় ভাই আরো বেশি লম্বা।

পাঠান চলে যাবার পর আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

ওই দিন পাকিস্তান হারলো ইনডিয়ার কাছে।

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে

সংসার

– ইব্রাহিম

যখন এসএসসি–তে পড়ি তখন মাথায় একটি চিন্তা, দুই বছর বাবা পেনশন নেবেন, ঘরের বড় ছেলে হিসেবে আমার দায়িত্ব নিতে হবে। তাই অর্থই মানুষের জীবনের সব কিছু। ছাড়লাম দেশ ও প্রথম ভালোবাসা। আমার প্রথম ভালোবাসা বর্তমানে আমেরিকায়।

বিদেশ মানেই কষ্ট সবাইকে ছেড়ে থাকার। এভাবে প্রায় আট বছর কাটিয়ে দিলাম।

ছুটিতে দেশে গেলাম। আমার দ্বিতীয় প্রেম ওসমানী মেডিকাল কলেজের ছাত্রী। আমি সুদর্শন ও সৎ চরিত্রের অধিকারী। আমাকে সে অনেক ভালোবাসতো, আমিও ঠিক তেমন।

দুজনে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখি। প্রথম থেকে গোপন রাখি আমার প্রবাস জীবন। একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে সব কিছু খুলে বলবো। যথাসময়ে বললাম।

সে চুপ করে রইলো। বললো আগামীকাল তোমাকে জানাবো।

বিকেল বেলা সে বললো, আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু আমার জীবনে কোনো মিডল ইস্টের ছেলেকে মেনে নিতে পারবো না।

বললাম, কেন?

বললো, প্রতিটি মানুষ বিয়ের পর এক সঙ্গে থাকতে চায়। তুমি চলে যাবে, না পাবে সুখ তুমি, না পাবো আমি। তুমি দেশে কিছু একটা করো, আমি তোমার সঙ্গে সারা জীবন থাকবো।

কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

বিদায়ের বেলা দুজনেরই চোখে পানি, আমরা দুজনেই এদিনটি মনে রাখবো। আমাদের মধ্যে আর দেখা হলো না। আমি চলে এলাম। প্রায় এক বছর পর তার একটি চিঠি পেলাম, সঙ্গে বিয়ের কার্ড। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আজ এ অর্থের জন্যই ভালোবাসার মানুষকে পেলাম না। এর কিছুদিন পর আরেকটি চিঠি পাই, আমি কোনো জবাব দিলাম না। শুধু লেখা, বিয়ে করে যেন সংসারী হই।

মনে হলো বিদেশে আসাকে করুণা দেখাচ্ছে বা উপহাস করছে। আমি বেছে নিলাম একাকীত্বের জীবন, যতো দিন বেচে থাকবো মা বাবা ভাইবোনের জন্য। বিয়ে করবো না, কাউকে অপেক্ষায় থাকতে হবে না।

ইউএই থেকে

বেত্রাঘাত বনাম ভালোবাসা

– প্রদীপ সাহা

আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘটে যখন আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র। যাযাদির *প্রবাসী সংখ্যায়* এ লেখাটি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ এ ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের স্কুলগুলোর একটি বড় ধরনের ত্রুটির ওপর আলোচনা করা এবং পাশাপাশি উন্নত দেশের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা।

ছাত্র হিসেবে খুব খারাপ ছিলাম না। আবার গড গিফটেডও ছিলাম না। নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম হওয়াতে সংগ্রামের মাধ্যমে উন্নতির শিখরে উঠতে হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই শিক্ষক বা অভিভাবকদের মার ভীষণ ভয় পেতাম, বিশেষ করে বেত্রাঘাত। আমি যখন ক্লাস ফাইভে ছিলাম তখন ইংরেজি ক্লাস নিতেন স্বয়ং

হেডমাস্টার। স্যারকে দেখলেই আমার বুক ধড়ফড় করতো। তার কারণ হলো স্যারের চোখ দুটো লাল এবং বিশাল আকৃতির, চেহারায় ভয়ংকর রাগী ভাব, হাতে সর্বদা তিন ফিট লম্বা জালি বেত। ইংরেজি ক্লাসটি হতো টিফিনের ঠিক পরে। তার আগেই ভয়ে টিফিনের পরের সকল ক্লাস ফাকি দিয়ে স্কুল থেকে আমি চলে যেতাম শুধু এই স্যারের ভয়ে। এভাবে কয়েকদিন চলার পর স্যার টের পেলেন আমার বিষয়টা।

একদিন দিনের প্রথম ক্লাসেই তিনি চলে আসেন অন্য স্যারের সঙ্গে বদল করে। কারণ একটাই, আমাকে শায়েস্তা করা। পাঠকরা বুঝতেই পারছেন, কেমন ধোলাই খেয়েছিলাম সেদিন। নিঃসন্দেহে গুরুতর অন্যায় বা ভুল কাজ করেছিলাম সেই অবুঝ বয়সে। কিন্তু তার জন্য নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাতের চেয়ে অন্যভাবে বোঝানো উচিত ছিল শিক্ষকের।

যাক সেই ধোলাই খাওয়ার পর স্কুল বাদ দিয়ে অগ্রজভাইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ি। ব্যবসায়ী ভাইটি আমাকে পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন। এভাবে চলতে চলতে বছরের শেষের দিকে আমার সবচেয়ে বড় ভাই যিনি অন্য শহরে সরকারি চাকরিরত তিনি ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে নজর দিলেন। আমাকে প্রচণ্ডভাবে বুঝিয়ে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। একজন ভালো শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ারও ব্যবস্থা করে দিলেন। সে বছর খুব সম্ভবত ১৯৭৫ সালে ক্লাস ফাইভ-এ সেন্টার পরীক্ষা হয়েছিল। মাত্র মাস খানেক পড়াশোনা করে মানসম্মানে পাস করেছিলাম। উপজেলার সবচেয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে সাধারণ বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হলাম। তখন থেকে দেমাগে কিছুটা জেদ আসতে শুরু করেছিল। এরপরও আমার জন্য স্বয়ং বড় ভাই ভীতিকর হয়ে দাড়ালেন। ক্লাসে ভালো মনোযোগী হওয়া চাই, ভালো রেজাল্ট চাই, ডাক্তার হওয়া চাই ইত্যাদি।

ক্লাস সেভেন পর্যন্ত প্রথম দশজনের মধ্যেই ছিলাম। মেধার ব্যাপক বিকাশ ঘটলো ক্লাস এইটে। তখন থেকে প্রথম স্থানের স্বাদ পাওয়া শুরু করলাম। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশনসহ যে রেজাল্ট করলাম তাতে শিক্ষকরা বেশ খুশি এবং গর্ব বোধ করেছিলেন। তার কারণ আমাদের স্কুলটি নাকি দীর্ঘ দিন যাবৎ এ ধরনের রেজাল্ট করেনি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আরো ভালো রেজাল্ট করে এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি প্রকৌশলীর সর্বোচ্চ স্থানটি দখল করে পাড়ি দিলাম এশিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি, ব্যাংককে মাস্টার্স করার জন্য। এখানেও খুব ভালো রেজাল্টের সুবাদে এবং জীবনের প্রথম কিছু ভালো কম্পানিতে চাকরির অভিজ্ঞতার ফলে আজ পরম করুণাময়ের কৃপায় সিডনি-র একটি বড় সরকারি প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক পদে কর্মরত।

আমার ধারণা, বাংলাদেশে অশিক্ষিতের এক ব্যাপক অংশ রয়েছে যারা প্রাইমারি স্কুল থেকে বিচ্যুত হয়েছে অমানবিক বেত্রাঘাতের শাসনে। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে হয় জোর করে, তাদের মনের বিরুদ্ধে। প্রাইমারি স্কুলের বয়সটা এতোই ছোট যে, দশ লাইন কবিতা মুখস্থ করানো সম্ভব। কিন্তু এর মর্মার্থ বোঝানো সম্ভব নয়। যদি তা নয় তাহলে কেন এ শিক্ষা ব্যবস্থা? কেন না পারলে বেত্রাঘাত?

প্রাইমারি স্কুল কেমন হওয়া উচিত তা এ প্রবাসে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছি।এ কথা ঠিক নয় যে এ দেশ উন্নত বা শিক্ষকের মেধা উন্নত মানের, সে জন্য এটা এখানে সম্ভব। মূল ব্যাপারটি হলো, শিশু মন বা অবুঝ মন যেভাবে চলতে চায় সেভাবে তারা গাইড করছে। বেত বলতে তো কিছু নেই। বরং হাত তোলাও বেআইনি।

আমার ছেলে ইয়ার টু ও মেয়ে প্-স্কুলে পড়ে। ছেলে যখন প্রথম দিন স্কুলে যায় (প্-স্কুলে) আমরা একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম এ ভেবে যে, সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে কান্নাকাটি করবে না তো! হয়তো ক্লাসে ঢুকবেই না। কিন্তু তাতো কিছুই হয়নি বরং সে ক্লাসে ঢুকে আমাদের দিকে ফিরেও তাকালো না। এর কারণ হলো এখানকার শিক্ষকদের মধুমাখা কথা ও বাচ্চাদের পছন্দলাগা ব্যবহার, তাদের পছন্দের খেলাধুলার ব্যবস্থা, আকাআকি ব্যবস্থা, বালি দিয়ে খেলার ব্যবস্থা তাদেরকে খুব আকৃষ্ট করে এবং এসব কিছু মোটেই ব্যয়বহুল কিছু নয়। যাক, মেয়েও একইভাবে স্কুলে অভ্যস্ত হয়ে গেল কোনো সমস্যা ছাড়াই।

ছেলে যখন ইয়ার ওয়ান–এ উঠলো ক্লাসে তখন কিভাবে পড়াশোনা করানো হয় তা দেখার জন্য অভিভাবকদের ডাকা হয়েছিল। ছেলের অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন ছুটি নিয়ে ছেলের ক্লাস দেখতে গেলাম। বিশেষ কোনো আয়োজন নয়, নিয়মিত ব্যাপার। শুধু আমাকে নীরবে বসে সব কিছু দেখতে হবে। উল্লেখ করার মতো যে, একটা ছেলে খুব দুষ্ট এবং শিক্ষককে পরোয়া না করে অমনোযোগী হয়ে ক্লাসে পাশের ছাত্রদেরকে যন্ত্রণা করছে। শিক্ষক দেখেও অনেকটা না দেখার ভান করছেন। মাঝে মধ্যে শুধু তাকে বলছেন Don't be silly Abe! আমাদের দেশে হলে উক্ত ছাত্রটির অবস্থা কি হতো তা বসে বসে ভাবছিলাম।
উল্লেখ্য, এখানকার স্কুলে চরম অন্যায়ের শাস্তি হলো, ছাত্রছাত্রীকে পৃন্সিপালের রুমে আধঘণ্টা বসিয়ে রাখা। এটাকে বলা হয় ডিটেনশন। ছাত্রছাত্রীরা ডিটেনশন–কে ভীষণ ভয় করে। কারণ ক্লাসের অনেক ফানওয়ার্ক ফেলে আধঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকা তাদের জন্য অনেক কষ্টকর, তাছাড়া সহপাঠীদের কাছে লজ্জার ব্যাপার তো আছেই। বিশেষ কোনো ধরনের অন্যায়ে এক দুইবার ডিটেনশন–এ ছাত্রছাত্রী ঠিক না হলে ছাত্র–শিক্ষক–পৃন্সিপাল–অভিভাবক মিলে মিটিং করে সমস্যা সমাধান করা হয়।
এখানকার ক্লাসে যা পড়ানো হয় তাতে মুখস্থ বলতে কিছু নেই। বাসায় যে হোমওয়ার্ক দেয়া হয় তা খুবই সামান্য এবং মুখস্থ বলতে করতে হয় না। ক্লাসে বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর প্রতি সপ্তাহে এওয়ার্ড দেয়া হয়। কার্যক্রমের কিছু উদাহরণ : Best reader, best writer, best speller, hard worker, good friend, well dressed, great helper, leader ইত্যাদি। প্রতি টার্মে (তিন মাসে এক টার্ম) যে ছাত্র বা ছাত্রী বেশি এওয়ার্ড পাবে বা শিক্ষক যাকে সবদিক দিয়ে ভালো মনে করবে তাকে বিশেষ সম্মান হিসেবে পৃন্সিপালের সঙ্গে মর্নিং টি–তে পাঠায়। মর্নিং টি–তে পৃন্সিপাল তাদেরকে সার্টিফিকেট দেন। সেখানে কিছু স্ন্যাকস বা চকলেট থাকে। ছাত্রছাত্রীরা সেগুলো খায়, গল্প করে। ছেলেমেয়ে মর্নিং টি–তে যেতে পারলে পিতামাতারা গর্ববোধ করেন। উপরোক্ত এওয়ার্ড সার্টিফিকেট দেয়া এবং মর্নিং টি–তে খরচ নগণ্য। কিন্তু সিসটেমটির দাম অনেক উচু।
এখানকার ছোট শিশু ছাত্রছাত্রীকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, স্কুল কেমন লাগে – নিঃসন্দেহে শত ভাগ উত্তর আসবে খুব ভালো। অনেক শিশু তো পারলে ছুটির দিনেও (শনি, রবিবার) স্কুলে যাওয়ার বায়না ধরে। এখানে শিশুদের প্রতি ব্যবহার বা তাদের মূল্যায়ন দেখে আমি মুগ্ধ হই। পাশাপাশি কষ্ট পাই আমার নিজ মাতৃভূমির শিশুদের কথা ভেবে। আমি জানি, আমাদের দেশ গরিব। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে এ লেখাটা তা পরিপূর্ণ করতে ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন শিশু মন বোঝা, তাদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া। তাই শাসনের মাধ্যম হওয়া উচিত ভালোবাসা, বেত্রাঘাত নয়।

সিডনি, অস্ট্রেলিয়া থেকে
pradip_saha1@yahoo.com

নিয়ন্ত্রিত অথচ মুক্ত দেশ হলান্ড

– মনিরুজ্জামান নান্নু

মালয়শিয়া থেকে মধ্য রাতে যাত্রা। সকাল সাতটায় হলান্ড নামে পরিচিত নেদারল্যান্ডস–এর শিপোল এয়ারপোর্টে পৌছি। ইওরোপ ভ্রমণের প্রথম দিন। বুকিং দেয়া লাগেজটা হাতে পেয়েই এয়ারপোর্ট পার হয়ে গেলাম। তখন মনে হলো কেউ লাগেজ চেক করলো না। অবশ্য লাগেজে ব্যবহারী জিনিস ছাড়া কিছুই নেই। বাংলাদেশে কয়েকজন বলেছিল, বাংলাদেশি দেখলে অনেক চেক করে। তাই মনে হলো ভুল করলাম না তো!

তখনোই জ্যাক অর্থাৎ আমাদের হোস্ট এবং কম্পানির CTO বললেন, যা চেক করার করে নিয়েছে। এ দেশে কাউকে অযথা হয়রানি করা হয় না।

প্রথম অভিজ্ঞতায় হলান্ডের মুক্ত নীতিতে মুগ্ধ হলাম। বিশ্বের মানচিত্রে ক্ষুদ্র একটি দেশ হলান্ড। বিশ্বের মোট ভূমির ০.০০৮% ভাগ দখল করে আছে। কিন্তু এর রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান দেখলে অবাক লাগে। এতো ক্ষুদ্র স্থান নিয়েও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম (আমেরিকা ও ফ্রান্সের পর) কৃষিজাত পণ্য রফতানিকারক দেশ। ইওরোপের বুদ্ধিবৃত্তি জড়িত অধিকাংশ ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয় এখান থেকে। বিশ্বের পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হলান্ড। অ্যামস্টারডাম, দি হেইগ (The Hague), রটারডাম প্রভৃতি শহরে সর্বত্র অসংখ্য টুরিস্ট দেখা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফুল রফতানি করে এ দেশটি। বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশটির অধিকাংশ লোকেরই নিত্যদিনের যান বাইসাইকেল। এ দেশে বাইসাইকেলের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এ একটা ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করে এ দেশের ট্রাফিক বা জনসংখ্যার সমস্যা। বিত্তবান পুরুষ, মহিলাও অনায়াসেই চালাচ্ছে সাইকেল। রাস্তার আশপাশে পড়ে থাকতে দেখা যায় বাইসাইকেল।

বাংলাদেশের মতো এই দেশটিও ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগপীড়িত। এ দেশে ঢাকা শহরের মতো প্রধান শহর অ্যামস্টারডাম ঘন বসতিপূর্ণ। কিন্তু সঠিক নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশটি নিয়ন্ত্রণ করে যাবতীয় সমস্যা। দেশটির দুই–তৃতীয়াংশেরও বেশি স্থল ভাগ সমুদ্র সমতলের নিচে অবস্থিত। বন্যা আঘাত হানতো অ্যামস্টারডাম শহরকে। কোনো কিছুই এখন এ দেশটির সমস্যা নয়। বরং এসব সমস্যা মোকাবেলায় গৃহীত সুপদক্ষেপগুলোই এখন দেশটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। সমস্ত অ্যামস্টারডাম জুড়েই তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য খাল। খালগুলোতে এবং বন্যাকবলিত স্থানে ভোল্ট পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে শহরের রাস্তাঘাট। এ জন্য অ্যামস্টারডাম শহরে দেখা যায় অনেক বৃজ। এ শহরে সর্বমোট ১৮২১টি বৃজ রয়েছে। এ বৃজ এবং খালগুলোর উপরে নৌকা ভ্রমণ (রিভার ক্রুজ) পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

একদিন সকালে রওনা দিলাম রটারডাম–এর দিকে। অ্যামস্টারডাম থেকে সোয়া এক ঘণ্টার পথ। যাওয়ার পথে দেখা যাবে, এ দেশের রাজধানী দি হেইগ যাকে শান্তির নগরী বলা হয়। কারণ এখানেই অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালত। এছাড়া আরেক শহর ডেল্ফট (Delft) যেখানে রয়েছে ইওরোপের এমআইটি বলে খ্যাত ডেল্ফট ইউনিভার্সিটি। ডেল্ফট দেখার জন্য ইউনিভার্সিটির কমপিউটার বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিককে দেখানোর জন্য ভদ্রলোকের আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেছে। রটারডাম–এর এক ঘণ্টার ট্রেন ভ্রমণ অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

ইওরোপের ট্রেন ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীদের আলাদা কম্পার্টমেন্ট একটি বিশেষ দিক। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এমন সবুজ–শ্যামল বোধহয় আমাদের দেশেও দেখিনি। বিস্তর মাঠ, ফসলি জমি, কোন আল নেই। আলের জায়গায় লম্বা করে সরু খাল কাটা আছে। পরে জানলাম বন্যার পানি। অতিবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে কাটা হয়েছে এসব সুগভীর খাল। হেইগ, লেইডেন, ডেল্ফট ঘুরতে ঘুরতে শুধু মনে হলো, আমাদের দেশকেও এমন করা যায়। সময়ের অভাবে পুরো রটারডাম ঘুরে দেখা হলো না।

শিল্প সাহিত্যের ব্যবসার বিভিন্ন মিউজিয়ামের অনেকগুলো হলান্ডেও রয়েছে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভ্যান গগ–এর চিত্রকর্ম নিয়ে জাদুঘর রয়েছে অ্যামস্টারডাম–এ। বিখ্যাত বিয়ার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হাইনিকেন–এর মূল ইন্ডাস্ট্রি এই দেশে। এর জাদুঘর রয়েছে অ্যামস্টারডামে যেখানে গেলেই পাওয়া যায় ফ্রেশ তিন গ্লাস বিয়ার এবং সুভেনির।

ইওরোপের একমাত্র হলান্ডেই পতিতাবৃত্তি ও স্বল্পমাত্রা ড্রাগ (১০ গ্রাম গাজা, কোকেন) বৈধ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ পতিতাপল্লি। শহরের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত পতিতাপল্লি।

অনেক পর্যটক কৌতূহলী হয়েই এ অঞ্চল ঘুরে আসে। এখানকার কফি শপগুলোতে গেলেই কোকেন, গাজা সেবনকারী পাওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। এক্ষেত্রে সরকারের নীতিও পরিষ্কার। পতিতা কিংবা মাদকসক্তরা নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকার ফলে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়ছে না। বৈধভাবে উপার্জন করছে। সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছে। একমাত্র হলান্ডে যে কোনো নাগরিক মুমূর্ষু অবস্থায় চাইলে ডাক্তারের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। একে বলে ইউথানেসিয়া। অসহনীয় কষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে যারা শ্রেয় মনে করে তাদের মৃত্যুবরণেও কোনো আইনি বাধা রাখা হয়নি। যে কোনো নাগরিক সে দেশে নিজ স্বার্থে মুক্ত। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নিয়ন্ত্রিতও বটে।

ইওরোপে প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি

অ্যামস্টারডাম শহরের ব্যস্ততম একটি জায়গা অ্যামস্টারডাম সেন্ট্রাল স্টেশন। ইওরোপের অধিকাংশ দেশের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ রয়েছে এই স্টেশনটির। ইওরোপের রেল ব্যবস্থার খ্যাতি বিশ্ব জুড়ে। স্টেশনে ঢোকার মুখে মনে হলো কিছু খাওয়া দরকার। ঢুকে পড়লাম একটি ফাস্ট ফুড শপে। এদিক-সেদিক খুজেও কোনো সেলসপারসন খুজে পেলাম না। বিভিন্নভাবে তাকে খাবার সাজানো। কাউকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবছি। তখনি দেখা গেল একজন লোক কয়েন ঢুকিয়ে খাবার বের করে আনছেন। গরম, ফ্রেশ ফাস্ট ফুড এভাবে কয়েন দিয়ে কেনা যায়! শেলফ-এর পাশেই প্রতিটি খাবারের দাম লেখা আছে। ওই পরিমাণ কয়েন দিয়েই বের হয়ে আসে গরম খাবার। কয়েন-এর ভাংতি দরকার হলে রয়েছে চেঞ্জিং মেশিন। গোটা ইওরোপের সর্বত্র রাজত্ব করে চলেছে কয়েন ভেন্ডিং মেশিন (Coin Vending Machine)। চকলেট, চানাচুর, কোলা ও অন্যান্য পানীয় কেনা, ট্রাম-বাস-ট্রেনের টিকেট কেনা, ডাক টিকেট কেনা ইত্যাদি খুচরো কেনাকাটার জন্য রয়েছে এই মেশিন। সমগ্র শহরকে একটি অটোমেটিক রূপ দান করেছে এই ছোট মেশিন, করেছে ডিসিপ্লিনড।

ইওরোপের প্রযুক্তির ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। দুই এক মাস ভ্রমণে এর ক্ষুদ্র একটি অংশই দেখা সম্ভব। কিন্তু কিছু প্রযুক্তি রয়েছে যা জনমানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এটা আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কাছেই অপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমেই এক একটি দেশ উন্নত অবস্থানে পৌছেছে।

বাংলাদেশ থেকে রওনা দেয়ার আগে থাকার ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। আমাদের হোস্ট জ্যাক বললেন তার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ঢাকা থেকে তিন দিনের বুকিং দিতে। সফটওয়্যার প্রফেশনাল হয়েও কাজটি নিজে না করে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম। অ্যামস্টারডাম পৌছেই শুনি সব কিছুই রেডি। হস্টেলে পৌছে বুকিং নাম্বার দিলেন জ্যাক। হস্টেল কর্তৃপক্ষ সিট নাম্বার দিল, টাকা নিল। ছোট বাড়ির মতো দেখতে এগুলো কম দামের ইয়ুথ হস্টেল। এই ছোট প্রতিষ্ঠানটিরও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করার মতো ওয়েব সাইট আছে! ওয়েব সাইট ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান ইওরোপে খুজে পাওয়া কঠিন। জনসংশ্লিষ্ট সেবা খাতগুলো এক্ষেত্রে দিচ্ছে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা। প্রতি মুহূর্তে আপডেট করছে যোগাযোগ, হোটেল পর্যটন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলো।

নেদারল্যান্ডস-এর একটি ছোট শহর ডেল্ফট। রটারডাম যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে নামলাম ডেল্ফট-এ। এক ঘণ্টা পর অন্য ট্রেনে রটারডাম যাবো। পনেরো মিনিট পর পর ট্রেন। এক ঘণ্টা ঘুরে এসে রটারডাম যাওয়ার পথে পর পর দুটি ট্রেন মিস করেছি। প্রতিবারই এক মিনিট লেট। প্রতি ঘণ্টায় অসংখ্য ট্রেনের সেকেন্ড নিয়ন্ত্রণ করছে যে প্রযুক্তি সেটা দেখার প্রবল ইচ্ছা হলো। কিন্তু হয়ে উঠলো না।

ভারী প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জার্মানি অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় দেশ। মার্সিডিস, ফোকসওয়াগেন, ওপেল, সিমেন্স-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত কম্পানির জন্ম এই দেশে। ফ্রাংকফুর্টের অদূরে রোজেলহাইম শহরে ওপেল-এর মূল উৎপাদন প্লান্ট। রোজেলহাইম-এর দুটি রেল স্টেশন এই কম্পানির কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রেখে তৈরি করা।

কম্পানিটির বিশালতা অবাক হওয়ার মতো। ওপেল লাইভ নামে স্থান থেকে দর্শণার্থীদের জন্য রয়েছে ফৃ গাইডেড টুর। কাউন্টারে পৌছাতেই তারা সময়সূচি জানিয়ে দিল। এক ঝাক স্কুল ছাত্রছাত্রীসহ কম্পানির বিশেষ বাসে রওনা হলাম। পুরো প্লান্টে দুই শতাধিক গেট রয়েছে। লম্বা মেটাল প্লেট থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে একটি অত্যাধুনিক গাড়ির মার্কেট যাওয়ার প্রক্রিয়া দেখানো হলো। গাড়ি তৈরির সমস্ত প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি অটোমেটিক। যখনিই কোনো মানুষের হাত লাগানোর দরকার তখনই নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্মীয়মাণ স্টেজটি এসে হাজির। কাজ শেষে চলে যাচ্ছে পরের স্টেজে। দুই ঘণ্টা সময় ওপেল-এর ইতিহাস, উন্নয়ন, বর্তমান অবস্থান ইত্যাদি বুঝিয়ে দিলেন গাইড। ফৃ গাইডেড টুরটি কম্পানি দেখে প্রতি মুহূর্তে এদের সমাজ সচেতনতার বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভূত হলো।

ওপেল ব্র্যান্ডটি পরিচিত হলেও রোজেলহাইম শহর বা এর অবস্থান পুরোপুরিই অজানা ছিল। প্লান্টটি ভিজিটের কোনো পরিকল্পনাও আমাদের ছিল না। কিভাবে পেলাম? তথ্য প্রযুক্তি সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে এরা, ইওরোপের ভ্রমণে চিন্তিত ছিলাম। এতো স্বল্প সময়ে কি আর দেখা যায়! হয়তো পথ চিনতেই দুই তিন দিন লেগে যাবে। কিন্তু অ্যামস্টারডাম শহরের হস্টেলে ঢুকেই দেখি সব কিছু রেডি। ফ্রন্ট ডেস্ক-এ রয়েছে সিটি ম্যাপ। আকর্ষণীয় স্থানের যাতায়াত সম্পর্কিত লিফলেট। প্রতিটি শহরের মোড়েই ইনফরমেশন লেখা দোকান যেখান থেকে ওই শহরের বিভিন্ন আকর্ষণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। তথ্যের এই অবাধপ্রবাহের কারণেই আঠারো দিনে পাচটি দেশের পাচটি প্রধান শহর দেখা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি শহরের হস্টেলে ঢুকে প্রথম কাজ ম্যাপসহ যাবতীয় ডকুমেন্ট কালেকশন। ফ্রেশ হয়ে স্টাডি পিরিয়ড। তারপর গোটা শহর থাকতো হাতের মুঠোয়।

বাংলাদেশ, বাংলাদেশি ইমেজ

ফ্র্যাংকফুর্টের ইয়ুথ হস্টেলের কাফেটিরিয়া-তে বসে পরিচয় হলো প্রায় ষাটউর্ধ বয়সের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তোমার দেশে বোধহয় প্রচুর কমপিউটার প্রফেশনাল রয়েছে।

এই মন্তব্য আরো দুই একজন বিদেশির মুখেও শুনেছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব লোকের অধিকাংশই ইনডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থান গুলিয়ে ফেলে। তবুও তাদের মন্তব্য অনেকাংশেই সত্য। বাংলাদেশের অনেক কমপিউটার প্রফেশনালই ইওরোপ, আমেরিকার আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে।

ইওরোপ ভ্রমণের শুরুতে পরিচিত একজন বলেছিলেন, এবার বুঝতে পারবে সারা বিশ্ব কোথায় আর আমরা কোথায়?

এ কথার পর পুরো ভ্রমণে বাংলাদেশ, বাংলাদেশিদের অবস্থান দেখার চিন্তাটা ঢুকে গেছে। এমনিতেই বর্তমানে বাংলাদেশ ইমেজ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। এ সূত্র ধরেই কিছু ঘটনা তুলে ধরছি।

চিত্র এক.

মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্স-এ আমাদের ফ্লাইট ছাড়ার সময় রাত সোয়া একটা। ঝামেলা এড়ানোর জন্য রাত বারোটায় রিপোর্ট করে বসে আছি। সাড়ে বারোটায় চেক ইন। পৌনে একটার দিকে আমার সহকর্মীসহ ইমিগ্রেশন গেট-এ পাসপোর্ট দিলাম, সঙ্গে আমাদের ভ্রমণের জন্য আমার কম্পানির দেয়া ডকুমেন্টস। দশ মিনিট পর ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জানালেন, আমার পাসপোর্টটাতে আলগা ছবি লাগানো হয়েছে, ইমগ্রেশন পাস দেয়া সম্ভব নয়। আট বছরের পুরনো পাসপোর্ট। এটা দিয়ে আমার বেশ কয়েকটি ভ্রমণের রেকর্ডও আছে। তাদের মন্তব্যের পেছনে যুক্তি জানতে চাইলে একজন আরেকজনকে দেখাতে শুরু করলো। অনেক গড়িমসি হলো।

এদিকে প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে আসছে। আমি ঘামতে শুরু করেছি। এয়ারলাইন্স-এর অফিসাররা এসে উপস্থিত। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা কিছু বলতে চায় মনে হলো। তাদের কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও নেই। এর মাঝে আমার সহকর্মীর কাছে এক অফিসার ত্রিশ হাজার টাকা চেয়ে বসলো। এটা দিলে ছেড়ে দেবো। তখনি আমার কাছে মনে হলো আমি তো বাংলাদেশি। দুর্নীতিতে এক নাম্বার এ দেশ! এক পর্যায়ে শক্ত হতে বাধ্য হলাম। নির্দিষ্ট সময়ের দুই তিন মিনিট পরে তারা পাস দিল। প্রায় দশ মিনিট পর প্লেন ছাড়লো। প্লেন-এ ঢোকার মুখে এয়ারলাইন্স লোকদের চেহারা দেখে খুব খারাপ লাগলো। সরি বলার ইচ্ছে হলেও মনে হলো, বলে কি লাভ!

চিত্র দুই.

প্যারিসের মেট্রো অর্থাৎ পাতাল ট্রেন, ওই শহরের প্রাণ। আমরা যে জায়গায় ছিলাম তার নাম মেরি ডি ক্লিসি। মেট্রো তার পাশেই। সেখানে এক পাকিস্তানি ভদ্রলোকের মুদি দোকান রয়েছে। প্রথমে বাংলাদেশি মনে হয়েছিল। তার মুখেই শুনলাম, এই অঞ্চলে অনেক বাংলাদেশি রয়েছে। শুনে একটা আনন্দ অনুভব করলাম। মনে হলো, কিছুক্ষণ মন খুলে গল্প করা যাবে। কিন্তু পাকিস্তানি দোকানির ব্যবহার কেমন অভদ্র মনে হলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কাউকে না পেয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন মেট্রো করে ফিরছি। দুজনকে দেখে এশিয়ান মনে হলো। একটু কাছ ঘেষে দাড়ালাম। মনে হলো বাংলায় কথা বলছে। দুই এক মিনিট পরই বুঝলাম তারা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। নিজ থেকেই পরিচয় দিলাম। মেট্রো থেকে বের হয়ে পাকিস্তানি দোকানটির কাছে আসতেই আরো দুজন বাংলাদেশির সঙ্গে পরিচয় হলো। সেলিম, শহীদ এবং আরো দুজন। কফি, সিগারেট এবং আড্ডা হলো। সেলিম সর্বক্ষণিক হাসি-খুশি, প্রাণচাঞ্চল্য ভরা মনে হলো। এক পর্যায়ে আমরা কতোদিন থাকবো, ভিসা, কাগজপত্র ইত্যাদি নিয়ে কথা হলো।

বললাম, মোট পনেরো বিশ দিন থাকবো এবং ফ্রান্সে থাকবো চার পাচ দিন।

এতে তারা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হলো। তারা সবাই চট্টগ্রামের কেন জিজ্ঞাসা করাতেই জানালো, সব অঞ্চলেরই আছে। জানালো, ফ্রান্সে বাংলাদেশি রাজনীতির খবর। বাংলাদেশি কোনো এক বড় রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য সেলিম। সেই অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি যাদের চাকরি, বাসস্থান সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। শহীদ তাদেরই একজন। অনেকক্ষণ আড্ডায় থেকে মনে হলো সুদূর ফ্রান্সে বসেও আমরা ছাড়তে পারিনি চট্টগ্রাম, বরিশাল, নোয়াখালি বিদ্বেষ, আওয়ামী লীগ-বিএনপি বিদ্বেষ।

একই চিত্র দেখা গেল ফ্র্যাংকফুর্টের এক সিলেটের অধিবাসী বাংলাদেশির দোকানে। পরের দিন তাদেরকে নিয়ে ফ্রান্সের একটা অঞ্চল ঘোরার সিদ্ধান্ত হলেও তাদের সঙ্গে আর দেখা হলো না। হয়তো জীবিকার তাগিদে সময় হয়ে ওঠেনি। ফেরার দিন একই দোকানে পরিচয় হলো আরো কয়েকজন বাংলাদেশির সঙ্গে। তাদের আড্ডার ধরন প্যারিসের স্বাভাবিক জীবন চিত্রের সঙ্গে বেমানান মনে হলো। এদের অধিকাংশই অবৈধ বসবাসকারী পাকিস্তানি দোকানির আন্তরিকতার অভাবের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে মনে হলো।

চিত্র তিন.

ফ্র্যাংকফুর্ট বই মেলা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বই মেলা। ফ্র্যাংকফুর্ট-এ পৌছেই দেখি অধিকাংশ লোকের কাধে বিশেষ ধরনের ব্যাগ। ডয়েশ ভাষায় লেখা বলে এর লেভেলের লেখার অর্থ বুঝতে পারলাম না। হস্টেলে এক পাকিস্তানি লোকের মুখে শুনলাম ফ্র্যাংকফুর্টে বই মেলা চলছে। এতো বড় বই মেলা দেখবো ভেবে ফ্র্যাংকফুর্ট

আসাটা সঠিক মনে হলো। ঘুরে–ফিরে বাণিজ্যিক নগরী আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু ঐতিহাসিক স্থান দেখা ছাড়া ফ্র্যাংকফুর্ট আসার সার্থকতা খুজে পাচ্ছিলাম না।

পরদিন চলে গেলাম ফ্র্যাংকফুর্ট শহরের উপকণ্ঠে মেসে স্টেশনে। এই স্টেশনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দুই লাখ বর্গ মিটার বিস্তৃত মেলাস্থল। কমপক্ষে একশ পাচটি দেশের ছয় হাজার সাতশ প্রতিষ্ঠান চার লাখেরও বেশি বই এবং ইলেকট্রনিক প্রকাশনা নিয়ে আসে বুক মেসে–তে। সুবিশাল আয়োজন। প্রতিটি স্টলের রয়েছে সুভেনির গিফটসহ নানান আয়োজন। আইটি, সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, ইলেকট্রনিক প্রকাশনা ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হলোগুলো। এক হল থেকে অন্য হলে যেতে শাটল ট্রেন ব্যবহার করতে হয়। আন্তর্জাতিক হলের একটি অংশ রয়েছে বিভিন্ন দেশের জন্য বরাদ্দ স্টল। হলের গেটে লাগানো ব্যানারে চোখে পড়লো বাংলাদেশের নাম। এতো দূরে এসে নামটি দেখার অনুভূতি বর্ণনা করা কঠিন। নামের পাশে দাড়িয়ে একটি ছবিও তুললাম। ভেতরে ঢুকেই দেখি বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল দেশের পতাকাসহ বিভিন্ন স্টল। তিনটি ফ্লোর–এ প্রায় দেড় ঘণ্টা খুজে কোথাও পাওয়া গেল না বাংলাদেশের স্টল। শেষে এক কুয়েতি প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে একটি খালি স্টল দেখিয়ে বললো, এখানেই বাংলাদেশের থাকার কথা। কিন্তু নেই।

এবারের বই মেলায় বাংলাদেশের একজন লেখককে বিশেষ অতিথির মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তাও আরেকটি সাইনবোর্ডে দেখেছি এই মর্যাদাও কতোটুকু রক্ষা করা হয়েছে তা জানার ইচ্ছা হলো। বাংলাদেশি একটি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থার স্টল অবশেষে একটি হলে পাওয়া গেল। অঙ্কুর প্রকাশনী। কিছু বই সাজানো। কোনো প্রতিনিধিকে পেলাম না। হয়তো একজন এসেছেন। কোনো কাজে বেরিয়েছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হল ছাড়লাম। প্রায় দশ ঘণ্টা ঘুরলাম। তারপরও অনেক অংশ বাকি রেখে আহত মনে হস্টেলে ফিরে গেলাম।

চিত্র চার.

আমাদের ভ্রমণের শেষ দেশ ইটালি। এখানে প্রচুর বাংলাদেশি রয়েছে। পরিচিত এক ভদ্রলোকের মেসে উঠলাম। ঢাকার আরামবাগের মতোই। রোমের একটি অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্লোর। মালিকও বাংলাদেশি। ফ্লোরে পনেরো ষোলজন বাংলাদেশি থাকে। এই শহরটি অন্য আট দশটা শহর থেকে আলাদা। ট্রাফিক জ্যাম, যত্রতত্র পার্কিং সবই আছে। পরিপূর্ণ বাংলাদেশি টাইপ আতিথেয়তা, আপ্যায়ন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশি জীবনযাত্রা, সংগ্রাম দেখে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আবার সংগ্রামী জীবন শেষে সফল, সচ্ছল ব্যক্তিও ছিল।

এ দেশের অনেকেই আট নয় লাখ টাকা খরচ করে সোনার হরিণের আশায় ইটালি যায়। যাওয়ার প্রক্রিয়াসহ তাদের অধিকাংশই অবৈধ বসবাসকারী এবং অদক্ষ। শিল্প, শিক্ষা, প্রযুক্তিতে উন্নত এই দেশে অদক্ষ লোকের কাজ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অবৈধ হলেও আরো কঠিন। জীবনের তাগিদে অনেকেই বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত হয়। ভিট্রিবি নামে স্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেখা যায় এই ধরনের অসংখ্য লোক। ওই অঞ্চলটি দোকান, হোটেলের অধিকাংশ এ দেশীয় কায়দার। একটি কাগজের (বৈধতার সনদ) আশায় এরা বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে। অনেক বাংলাদেশি ফুটপাথে অস্থায়ী ব্যবস্থা খুলে বসেছে। কেউ রাস্তায় ফুল বিক্রি করছে। পুলিশ ধরেও নিয়ে যাচ্ছে। এ এক দুঃসহ সংগ্রাম। কিন্তু যে টাকা, যে শ্রম তারা দিচ্ছে তা এই দেশে দিলে সাফল্য অবশ্যই ধরা দিতো। তারা তা দেয় না, হয়তো শ্রমের সঠিক মূল্যও পায় না। বিদেশে তাদের কর্ম বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রতিনিয়ত নষ্ট করছে এতে সন্দেহ নেই।

একান্তই আমার বাংলাদেশ

ভ্রমণটা বেশ কিছুদিনের প্রস্তুতির মধ্যেই শুরু হয়েছিল। অনেকেই জানে। আমার অপছন্দ সত্ত্বেও রাত বারোটায় মামা, এক বন্ধু এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে এসেছিল। বাবাও আসতে চেয়েছিলেন। বয়সের দোহাই দিয়ে না করেছি। এরপর বিশ দিনের এই সফরে ঢাকায় ফোন মেইল হয়েছে অসংখ্যবার। ভাইয়া আমেরিকা থেকে খবর নিয়েছেন বেশ কয়েকবার। ফিরে এসেই মায়ের হাসিমুখ। গর্ব করার তো অনেক কিছুই আছে আমাদের।

zaman02@hotmail.com

বাথা

- মোহাম্মদ মনিরুল হক রাসেল

পড়তে কিংবা চাকরির উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে যাবো তা কলেজ জীবন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম। আর এর জন্য চেষ্টা-তদবিরও করে যাচ্ছিলাম, বিশেষ করে কানাডার জন্য। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে আসবো তা চিন্তায়ও ছিল না। অবশেষে তাই হলো। ২০০২ সালের ১৫ অক্টোবর একটি পলিক্লিনিকের একাউন্টেন্ট-এর চাকরি নিয়ে চলে এলাম সউদি আরবের রিয়াদে।

কর্মস্থল হলো বাথা-য় *ছাফা মক্কা বাংলাদেশি পলিক্লিনিকে।* বাথা নামটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যিনি রিয়াদে আছেন বা ছিলেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে খাজ্জান স্ট্রিটের উত্তর পাশে গড়ে ওঠা বাংলাদেশি মার্কেটের দৃশ্য। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের হাজার হাজার বাঙালির সমাগমের দৃশ্য মনে হবে, কানে ভেসে আসছে সেই মধুর ডাক, *দেশি, ফোন করবেন ফোন, পান লাগবে দেশি পান, বিড়ি, সবজি* ইত্যাদি।

সময়ের প্রয়োজনেই ইংল্যান্ড, আমেরিকার মতো রিয়াদের বাথায়ও বাংলাদেশি মার্কেট গড়ে উঠেছে। কোন প্রবাসী বাংলাদেশি এখানে প্রথম দোকান পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে ধুধু মরুর দেশে বাংলাদেশিদের মনে অল্প সময়ের জন্য হলেও প্রশান্তির জোগাড় করে দেয়ায় তাকে ধন্যবাদ।

এখানে ঢুকলেই আপনি দুদিকের দোকানপাটে দেখতে পাবেন বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড, দোকানিরা প্রায় সবাই বাংলাদেশি। আপনার প্রয়োজনের প্রায় সব দেশি জিনিস অর্থাৎ আকিজ বিড়ি, রাজশাহীর পান থেকে শুরু করে লাল শাক পর্যন্ত এখানে পাবেন।

মার্কেটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিশ্চিন্তে বাংলা ভাষা চালিয়ে দিতে পারেন। ক্ষেত্র বিশেষে আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহার করতে পারেন নির্দ্বিধায়।

নিজ জেলা, এমনকি থানার দেশিভাইকে সহজে খুজে বের করার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে জেলাওয়ারি গলি। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার এলেই দেশের টানে, দেশিভাইয়ের টানে রিয়াদের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ছুটে আসে হাজার হাজার বাংলাদেশি। হোটেল, দোকানের সামনে, গলির দুপাশে বসে পান খেয়ে, বিড়ির ধোয়া ছেড়ে মন খুলে বলতে শুনবেন তাদের প্রবাস জীবনের সুখ-দুঃখের কথা। তবে আলাপের শীর্ষ ভাগই হবে সমস্যার কথা। যেমন চার মাস ধরে বেতন নেই, এক বছর হয়ে গেল আকামা বা অনুমতিপত্র নেই, ভিসা দেবে বলে কফিল টাকা নিয়েছিল, এখন সে উধাও ইত্যাদি।

বাথায় যেমন সুখের খোরাক পাওয়া যায় তেমনি ছিটে-ফোটা দুই একটা বিষাদের ঘটনাও ঘটে থাকে। যেমন ভিড়ের মধ্যে আকামা চুরি যাওয়া, মতুয়া, জাওয়াজাত এবং বলদিয়া পুলিশের ধাওয়া খাওয়া ইত্যাদি।

তবে এতোকিছুর পরেও রিয়াদে বাংলাদেশিদের প্রাণের হাট বাথা বাংলাদেশি মার্কেট স্মৃতিতে অম্লান।

সউদি আরব থেকে
monirsafa2@hotmail.com

বড় পাওয়া

– বুসরা মেহেদী

ভালোবাসার আরেক নাম জীবন। আর প্রবাসের সেই জীবন থেকেই আমাদের জীবনের গল্প শুরু। তখন ১৯৯৬ সালের শেষের দিকের কথা। সব কিছু এখনো স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমি তখন এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠবো আর জুয়েল মাত্র চায়নিজ ভাষা শেষ করেছে। গল্পের শুরু তখন থেকে। হঠাৎ একটা ফোন, আমি বাংলাদেশে এবং সে চায়নায়। ফোনটা যখন এসেছিল তখন কারোই জানা ছিল না কারো পরিচয়।

জুয়েল ফোন করেছে রং নাম্বারে আর আমি রিসিভ করেছিলাম ফোনের রিং বেজে উঠেছিল বলে। আসলে জুয়েল রং নাম্বারে ফোন করেছিল এটা বলা ঠিক হবে না। তার ধারণাটাও ভুল ছিল না। তখন বাংলাদেশের সব এনালগগুলো ডিজিটালে রূপান্তর করার কাজ চলছিল। শেষে চারটা সংখ্যা ঠিক থাকতো এবং প্রথম দুই সংখ্যার জায়গায় তিনটা সংখ্যা দিতে হতো। জুয়েল করেছিল তার ফুপুর কাছে। সে যেখানে ফোন করতে চেয়েছিল সেই জায়গার একচেঞ্জ নাম্বারটা মোটামুটি জানতাম। তারপর তাকে বলেছিলাম সঠিক নাম্বারটা জানার জন্য, আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো। জুয়েল পরে ঠিকই ফোন করেছিল। কিন্তু সেদিন আমি ধরিনি। ধরেছিল আমার মা, মাকে অবশ্য আমি বলে রেখেছিলাম, এ রকম চায়না থেকে কোনো ছেলে ফোন করলে তাকে যেন সঠিক নাম্বারটা জানানো হয়।

গল্পটা ওখানেই শেষ হতে পারতো।

কিন্তু আবার শুরু হলো।

পনেরো ষোল দিন পর জুয়েল আবার ফোন করলো। সেদিন আমিই ধরেছিলাম। ফোনটা ছিল ধন্যবাদ দেয়ার জন্যই জানা হলো কে কি করছে। এই যেমন আমি কিসে পড়াশোনা করছি, জুয়েল চায়নাতে কি নিয়ে পড়াশোনা করছে। আমার কণ্ঠ এতো চিকন ছিল যে, সে বিশ্বাস করতে চায়নি আমি কলেজে পড়ি। জুয়েল বলছিল, স্কুলে পড়ি আর আমি বলেছিলাম কলেজে পড়ি। এই তো সেদিন আমাদের কথা এখানেই শেষ ছিল। তৃতীয়বার যখন জুয়েল ফোন করলো তখন একটা অনুমতি চাইলো যেটা আমাদের বাঙালি মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলাটা সবাই পছন্দ করে না।

অনুমতিটা আমি দিয়েছিলাম আমার বাবা–মা দুজনের সঙ্গে কথা বলে। তারপর থেকে কথা বলা শুরু। ফোনে কথা বলতে বলতে এক সময় মনে হলো তাকে বন্ধু হিসেবে ভাবা যায়। তার ঠিকানা প্রায়ই আমাকে দিতো। এক সময় মনের অজান্তেই তার ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। সেটাই প্রথম চিঠি আমার, তার কাছে লেখা।

এরপর বেশ কিছুদিন ফোনে কথা বলেই কেটে গেল আমি। যখন এইচএসসি ফাইনাল দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন জুয়েল তার পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ দুজনেরই শর্ত হলো ছবি পাঠাতে হবে এবং সেটা একই দিনে পোস্ট করতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। ছবিসহ চিঠি পোস্ট। চিঠি পাবার আনন্দটা যে এতো বড় হয় কখনো জানা ছিল না। দুজনই দুজনার ছবি দেখলাম, ভালো লাগলো। পছন্দ হলো। তারপর সময়গুলো কেমন করে কেটে গিয়েছে বলতে পারবো না।

দুজনার দেখা হয়নি। আগে থেকে কোনো পরিচয় ছিল না। কারো সাহায্যও ছিল না। শুধু ছিল বিশ্বাস। বিশ্বাসের ওপর দাড়িয়ে আমরা দুজন দুজনকে এতোটা ভালোবেসেছিলাম যে, আমাদের কাছে অন্য সব কিছুকে ছোট মনে হতো। কখনো মনে হয়নি আমি তার সঙ্গে ছলনা করছি কিংবা সে আমার সঙ্গে অভিনয় করছে। দুজন বেশ ছিলাম। চিঠি, ফোন সব কিছু চলছিল।

দুই বছর পর ১৯৯৮ সাল জুয়েল ছুটি পেল গ্রীষ্মের। হঠাৎ আমাকে জানালো, সে বাংলাদেশে আসবে কিছুদিনের জন্য। সেই আমাদের প্রথম দেখা ১৯৯৮ জুলাইতে এয়ারপোর্টে। ভাগ্য ভালো, বাসা থেকে অনুমতি পেয়েছিলাম এয়ারপোর্টে যাবার। অবশ্য এর জন্য অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। তারপরও জুয়েলকে যখন দেখেছি তখন সব ভুলে গিয়েছিলাম। আমার নাম ধরে যখন ডাকলো তখনই বুঝতে পারলাম এই সেই ছেলে যার সঙ্গে শুধু ফোনেই কথা বলেছি। এরপর আমরা আরো কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। যতো দেখলাম ততোই যেন ভালোলাগতে শুরু করলো।

আমরা এখনো বিশ্বাস করি আল্লাহ সহায় না থাকলে আমাদের ওপর কারোই সাধ্য ছিল না এতো দূরে থেকে না দেখে একজন আরেজজনের মনের মাঝে স্থান করে নেয়াটা। এরপর দুই পরিবারের পরিচয় হলো। তখন বিয়ের কথা একটু উঠেছিল। তবে আমাদের পড়াশোনার কথা ভেবে সময়টা আরো বাড়িয়ে দেয়া হলো।

দুই মাস জুয়েল বাংলাদেশে ছিল। খুব স্বপ্নের মতো কেটেছিল সেদিনগুলো। দুই মাস পর আবার যখন আমরা আড়াল হয়ে গেলাম সেই কষ্টটা ছিল খুব বেশি। তখন মনে হয়েছিল, দেখা না হলেই মনে হয় ভালো ছিল।

এরপর আমরা কমপিউটারের মাধ্যমে সব যোগাযোগ রাখলাম। তখন ই-মেইল, অনলাইনে কথা বলা, এসব যেন খুব কাছে করে দিল দুজনকে। পড়াশোনাও দুইজন চালিয়ে যেতে লাগলাম। দেখতে দেখতে দুই বছর কাটিয়ে দিলাম। কমপিউটারের উপর গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলো জুয়েল আর আমি ডিগ্রিটা শেষ করলাম।

দুই বছর পর আবার আমাদের দেখা হলো। তখন ২০০০ সাল। আমাদের এতোগুলো দিন, মাস, বছরে না দেখার কষ্টগুলো। দূরে থাকার কষ্টগুলো সব যেন আমাদের আরো কাছে এনে দিয়েছিল ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। এক সময় বিয়ের কথা উঠলো। আমাদের বিয়ে হলো সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে। তখন মনে হলো জীবনে এর থেকে বড় পাওয়া, এর থেকে বড় আনন্দের আর কি থাকতে পারে একটা মানুষের জীবনে যখন ভালোবাসার প্রিয়জনকে আপন করে পাওয়া যায়।

বিয়ের কিছুদিন পর আবার সেই প্রবাসে চলে আসা। উদ্দেশ্য, জীবনের একটা লক্ষ্যে পৌছানো। আমেরিকাতে তার চাকরি।

এখন আমরা আমেরিকাতেই এক সঙ্গে আছি। এক সময় প্রবাসটা খুব কষ্টের ছিল আমাদের জন্য। আর এখন প্রবাসে বসে খুব মিস করি আমাদের দেশকে।

টেক্সাস, ইউএসএ থেকে

মন্দ ভাগ্য

– জান্নাতুল খান মুক্তি

ফোনে বিয়ে হয়েছে আমার। এক বছর ধরে স্বামী প্রবাসে থাকে। আমি দেখিনি, ছবি দেখেছি। তার সঙ্গে আমার ফোনে দুই এক ঘণ্টা করে কথা হতো। সে বলে, আমার মনে হয় না আমি তোমাকে দেখিনি। মনে হয় আগে থেকে চিনতাম।

তার সঙ্গে গল্প করে, তার কথা শুনে আমিও তাকে না দেখেই ভালোবেসেছি। কিন্তু সম্প্রতি সে ফোন খুব কম করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, দেশে এলে অর্থের প্রয়োজন আছে।

যাকে ভালোবেসেছিলাম তাকে পেলাম না। তিন বছর পার হয়ে চার-এ পড়লো স্বামীকে কাছে পেলাম না। আমার ভাগ্যটাই খুব মন্দ। এখন আমার জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা চলে এসেছে।

একটু যে হাসি-আনন্দে মনকে প্রফুল্ল রাখবো তারও উপায় নেই। পারিবারিকভাবে খুব মানসিক টর্চার করে। স্বামী আমাকে শুধু শোনাচ্ছে আজ আসবে তো কাল আসবে। আমি দিনের পর দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি।

ধৈর্য্যে ফল নাকি ভালো হয়। সে অপেক্ষায় আছি। যাকে দুই চোখে বাস্তবে দেখিনি শুধু শুনেছি। বাকি জীবনটা দেখি কি হয়! আমার চরম কষ্টগুলো ঘোচে কি না?

নারায়ণগঞ্জ থেকে

এক টুকরা মাংস

– মোহাম্মদ শওকত হোসেন ফারুক

সোনার হরিণের সন্ধানে নয়, মা বাবার মুখে দুবেলা দুই মুঠো আহারের নিশ্চয়তার জন্য মরুভূমির দেশ ইউ.এ.ই বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে এসেছি। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্য থেকেও প্রবাসীদের মধ্যে ঈদে কান্না মিশ্রিত হাসি দেখা যায়। অবশ্য নতুনদের কথা ভিন্ন। তাদের কান্না পুরনো যারা নিজের কষ্ট চেপে রেখে নতুনদের সান্ত্বনা দেয়।

আমার জীবনে প্রবাসে প্রথমবারের মতো এলো কোরবানির ঈদ। আমিরাতে ঈদের নামাজ সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পড়া হয়। তাই ঈদের দিন ভোর পাচটায় ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে খেলাম হোচট। বাথরুমে এক ফোটা পানিও নেই। গোসল দূরে থাক, মুখও ধুতে পারিনি। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি এক ইজিপশিয়ান রেস্টুরেন্টে চাকরি করি। খাওয়া ও থাকা ফৃ। ঈদের দিন ছুটি নেই। তাই এগারোটায় ঘুম থেকে উঠে চলে গেলাম কর্মস্থলে। ঘটনা এখানে শেষ হলে ভালো হতো। কিন্তু ভোরের সেই বিব্রতকর ঘটনার চেয়ে আরো অনেক বড় বিব্রতকর ঘটনা আমার জন্য অপেক্ষা করছে যা কল্পনাও করতে পারিনি।

দুপুরে খাওয়ার সময় বাবুর্চি বললো, আজ যেহেতু ঈদ সেহেতু সবাইকে মাংস খেতে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, রেস্টুরেন্টে স্টাফদের মাংস খাওয়া নিষেধ ছিল। আমি খাওয়া শুরু করবো এমন সময় মালিক এসে হাজির। আমার প্লেটে এক টুকরা মাংস দেখে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বললো, তোমাকে মাংস খেতে কে দিয়েছে?

আমি খুব ভয় পেয়ে নীরব থাকলাম। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা মেরে প্লেটটা নিচে ফেলে দিল। সেই সঙ্গে যা-তা বলে বকাঝকা করতে লাগলো।

প্লেট নিচে ফেলে দেয়ার পর আমার চোখ থেকে শুধু পানি ঝরতে লাগলো। কিন্তু মুখে কোনো কথা বের হলো না।

লজ্জায় কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। এক টুকরো মাংসের জন্য এতো লাঞ্ছনা। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ নিষ্ঠুরতার মধ্যে আর নয়। দেশে চলে যাবো। কিন্তু যখন স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো, মায়ের কষ্ট, বাবার দীর্ঘশ্বাস ও আমার প্রাণপ্রিয় এক মাত্র ছোট ভাইয়ের অবুঝ মনের আবদার। সংসারে অভাবের কারণে যার খুব সামান্য আবদারগুলোও পূরণ করতে পারিনি। আমাকে তাদের জন্য হলেও থাকতে হবে এ নিষ্ঠুরতার মধ্যে।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতোদিন এ দেশে থাকবো ততোদিন এক টুকরা মাংস খাওয়া তো দূরে কথা, স্পর্শও করবো না।

এ লজ্জা ও অপমানের কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে পারিনি।

সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে

অপচয়কারী

– মনিরুজ্জামান খোকন

সময়ের প্রয়োজনে ১৯৯৬ সালে চলে যাই দক্ষিণ কোরিয়াতে। অনেক কষ্ট সাধন করে অবশেষে নামিয়াংজু এসে তরী ভেড়ে। কোরিয়া সরকার এই এলাকাতে প্রতিবন্ধীদের অনেক জমি দিয়েছে বসবাস করার জন্য। তাই এখানে অনেক বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের দেখা মেলে।

সময়ের বিবর্তনে এই এলাকা ফ্যাক্টরিতে পরিপূর্ণ। প্রতিবন্ধীদের ভাগ্য ফিরেছে। এখানেই এক ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। আমার পাচজন সহকর্মীর একজনের নাম ছিল রিপন। সে ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রবাসী। আমার এই লেখা রিপনকে নিয়ে।

সবাই কাজ করি। রিপন ছাড়া সবাই প্রতি মাসে টাকা দেশে পাঠাই। রিপন মদ, জুয়া আর মেয়ে নিয়েই সময় কাটায়। অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ফলাফল বাংলাদেশের কৃকেটের মতো।

রিপনকে জিজ্ঞাসা করতাম, কেন দেশে টাকা পাঠাও না? সে বলতো, কার জন্য পাঠাবো, কে খাবে? অভাব নেই ইত্যাদি।

ভাবতাম, হয়তো ধনী ঘরের ছেলে হবে। এরই মধ্যে রিপনের চাচাতো ভাই কোরিয়াতে আসে এবং তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তার নাম ছিল সেলিম। সে মাঝে মধ্যে বলতো, রিপনকে একটু বুঝিয়ে মানুষ করো। তার বড় ভাইয়ের একটা হাত না থাকায় প্রায় কর্ম অক্ষম। তৃতীয়জন সিংগাপুরে প্রবাসী। দেশে টাকা পাঠায় না। চাচি খুব কষ্টের মধ্যে আছে ইত্যাদি।

একদিন সন্ধ্যায় সেলিম আসে আমার কাছে। খুব বিষণ্ন লাগছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই বললো, রিপনের মা চিঠি লিখেছে।

চিঠির মূল বক্তব্য ছিল এ রকম, বাবা রিপন, তুমি দীর্ঘ দিন কোরিয়াতে। তোমার ছোট এক ভাইও দীর্ঘ দিন সিংগাপুর প্রবাসী। গ্রামের সবাই বলে, আমাদের দিন ভালো যাচ্ছে। কেমন ভালো যাচ্ছে বাবা জানো? আমার প্রতিদিন বারো টাকার ওষুধ লাগে। এই বারো টাকা জোগাড় হয় না। ঠিকমতো ভাতই জোটে না, ওষুধ পাবো কোথায়? গ্রামের লোকজন বলে, যার দুই ছেলে বিদেশে তার অভাব কিসে? লজ্জায় কারো কাছে হাত পাততে পারি না। তোমার ছোট ভাই চাচার বাসায় থেকে পড়াশোনা করে। সে চিঠিতে লিখেছে, মা, এখানে আমি একবারও পেট ভরে খেতে পারি না। এখানে খাবারের কোনো অভাব নেই। ওনারা বড়লোক, টেবিলে অনেক রকম খাবার থাকে। কিন্তু যখনই খেতে বসি তখন শুধু মনে পড়ে তোমার কথা। তুমি হয়তো শুধু লবণ দিয়ে ভাত খাচ্ছো। মা, রিপন ভাইকে তুমি বলো আমাকে বিদেশে নিয়ে যেতে। মা, আমি একবার বিদেশে যেতে পারলে তোমার কোনো কষ্ট থাকবে না। নিয়মিত ওষুধ কিনে দিতে পারবো।

সেলিমের মুখে এই ঘটনা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। বেদনায় আতকে উঠি। এরপর অনেক চেষ্টার পর রিপনকে বাধ্য করি কিছু টাকা পাঠাতে। এরই মধ্যে সময়ের স্রোতে কে কোথায় চলে যাই কারো কোনো খবর নেই।

আমি দেশে, তারা এখনো বিদেশে। এমন অনেক রিপনকে দেখেছি যারা প্রচুর পরিশ্রম করে টাকা আয় করে শুধু নষ্ট করার জন্য। অনেক রিপনকে দেখেছি যাদের বৌ অপেক্ষা করছে স্বামীর জন্য, যাদের বাচ্চারা অপেক্ষা করছে বাবার জন্য, যাদের মায়েরা আর্তনাদ করছে সন্তানের মঙ্গলের জন্য। অথচ রিপনরা ...! ধিক তাদের।

হাজারীবাগ, ঢাকা থেকে

খেলার এক পরিণতি

– মাহমুদ হাসান

তিন বন্ধুতে গল্প চলছিল। হাবলু, হোসেন আর জাভেদ। দেশে হলে বোধহয় বলা যেতো আড্ডা চলছিল। লন্ডনে জিনিসটা একটু অন্য রকম। এখানে আড্ডা দেশের মতো সে রকম জমাট হবার সম্ভাবনা কম। এখানে কাজ আছে সবার। কাজ করতে হয় সবাইকে। আজ যারা গল্প চালাচ্ছে, কাল তাদের তিনজনকেই উঠতে হবে সাতটার মধ্যে। তিনজনেরই কাজ সকালে। তাছাড়া লন্ডনে আড্ডার আরেকটা অসুবিধা আছে। এখানে চা বা অন্য কিছু খাবার–দাবার নিজেদেরই বানাতে হয়। দেশে তো এসব বানানোর জন্য অন্য লোক থাকে। ফলে আড্ডায় ছেদ পড়ে না। তবে এখানকার গুলগপ্পের আসরকে বোধহয় *মিনি আড্ডা* বলা চলে।

গল্প চলছিল হাবলুর ঘরে। ঘরটি একই সঙ্গে শোবার, বসার ও রান্নার। ইংরেজিতে বলে বেডসিটার। জায়গাটাকে বৃক্সটন বলা যায়। অবশ্য ঠিক পুরোপুরি বৃক্সটন নয়। ওভাল ও বৃক্সটন–এর মাঝামাঝি। একটু বৃক্সটনের দিকে। ওই টেরাসড বাড়ির আরেক ঘরের বাসিন্দা হোসেন। তবে গল্প–গুজব সব সময় হাবলুর ঘরেই চলে। কেননা হাবলুর ঘরটা বড়। সবাই হাত–পা ছড়িয়ে বসতে পারে। এদিনকার আসরের কোনো কিছুই আগে থেকে ঠিক ছিল না। স্কুলের কাজ শেষ করে জাভেদ এদিক–সেদিক একটু ঘোরাঘুরি করে লুইশাম থেকে হাজির হয় হাবলুর বাড়ি। হাবলু তখন সিভিল সার্ভিসের কাজ সেরে বাসায় ফিরেছে। হোসেনও তাই।

তাদের গল্প চলছিল টিন কেটে বের করা চাকা চাকা বিফ ও লাগার–এর সঙ্গে। তখন টিনে ভরা বিয়ার বড় একটা দেখা যেতো না। বোধহয় বাজারে বেরও হয়নি। লাগার পাওয়া যেতো বেশ। বিয়ার পাওয়া গেলেও এরা বোধহয় লাগারই খেতো।

ছোট আড্ডাটা এক সময় এসে মোড় নিল মেয়েদের নিয়ে। ইংরেজ মেয়েদের নিয়ে। জাভেদ বলছিল তাদের স্বভাবের কথা। স্বভাব ও অভ্যাস থেকে কিভাবে জীবন গড়ে ওঠে তার কথা। ছেলেদের সঙ্গে কোনো একটা ইংরেজ মেয়ে যায়, শোয়। একের পর এক এভাবে যেতে যেতে একজনের সঙ্গে পড়ে যায়। মনে করে সে তার প্রেমে পড়ে গেছে এবং ওদের পরস্পরের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাকেই তখন মেয়েটা তার জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়।

কথাটা জাভেদের উপস্থিতিতে দুজন বন্ধু মন দিয়ে শুনেছিল। জিনিসটা যে তারাও জানতো না তা নয়। তবে এ ব্যাপারে আলোচনা তারা দীর্ঘতর করতে চায়নি। এরপর আরো দুই একটা বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কোনোটাই আগেরটার মতো অর্থাৎ ইংরেজ মেয়ের জীবনসঙ্গী বাছার ব্যাপারটার মতো জমেনি।

খোশগল্পের আসর সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ভেঙে গিয়েছিল। সাড়ে দশটাতেই। সেদিন ছিল সোমবার। সামনে পড়ে আছে কাজের পুরো সপ্তাহ। বিদায় নিয়ে উঠে গেল জাভেদ। তারপর পরই হোসেন গিয়ে ঢুকলো তার ঘরে।

পচিশ বছর পর সেদিনের সেই জীবনসঙ্গী বাছার প্রক্রিয়া ও তার মিলনান্ত পরিণতির কথা হাবলুর বার বার মনে পড়ে। জীবনসঙ্গী বাছার এ রকম ব্যাপারটা শুধু ইংরেজ মেয়ে কেন, ফরাশি, জার্মান বা ইওরোপের বা কোনো দেশের মেয়েরও হতে পারে। শুধু মেয়েই বা কেন? ছেলেদের বেলায়ও একই জিনিস প্রযোজ্য। এটা একটা খেলা। খেলার শুরু আছে, শেষও আছে। শেষে আসে মিলন।

জিনিসটা যদি অন্য রকম হয় তাহলে? চলতে চলতে পরিণতিতে যদি একেবারে অন্য রকম হয়। তাহলে? পচিশ বছর পর থেকে থেকে বার বার মনে আসে হাবলুর। একটা ছেলে এভাবে চলতে গিয়ে একটা মেয়েকে পেল যার সঙ্গে তার সম্পর্ক হলো সম্পূর্ণ। কথা–বার্তা, আচার–আচরণ, দেয়া–নেয়া যার ভেতর ছিল যৌন সম্পর্কও। সব দিক থেকে সম্পূর্ণ। ছেলেটি কালো এবং পুরো মাত্রায় বর্ণ সচেতন। মেয়েটি ছিল শাদা। কিন্তু

বর্ণের ব্যাপারে তার কোনো বোধ ছিল না। মেয়েটির কাছ থেকে এ রকম কোনো সচেতনতার আভাস ছেলেটি কোনোদিন পায়নি। কালো ছেলেটি তার ত্রিশ বছরের ইওরোপ জীবনে এই প্রথম পেয়েছিল এমন একটা মেয়ে। চেহারার কথাও মনে পড়ে হাবলুর। দেখতেও ভালো ছিল ফরাশি সেই মেয়েটি।

এমন একটা সম্পর্কের পরিণতি কিছুই হলো না। ছেলেটি এগোয়নি। স্থায়ী সম্পর্ক পাতানোর কোনো আভাস মেয়েটিকে সে দেয়নি। কেন দেয়নি তা সে জানে না। মেয়েটিও দেয়নি। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মনিক নামের সেই মেয়েটি ফিরে গেল তার দেশ ফ্রান্সে। সেখান থেকে যেন কোথায় যাবে বলেছিল তা আজ হাবলুর মনে নেই।

আজ তার বার বার মনে হয়, কেন সে এগোয়নি? কোনো কারণ খুজে পায় না হাবলু। সারা জীবন তাকে এ জন্য পস্তাতে হবে তা হাবলু জানে। এমন জিনিস হাতে পেয়েও হাতে রাখার কোনো চেষ্টা করেনি হাবলু। এ জ্বালা থেকে কখনো কি আর সে মুক্তি পাবে?

জীবনের এ এক পরিণতি। খেলতে খেলতে খেলার এ কি পরিণতি!

লন্ডন থেকে